হারাণো-স্মৃতি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দাম দু' টাকা

হারানো-স্মৃতি

মেয়েটী যেদিন জন্মিল, সেইদিনের সে-সময়টা যে নেহাতই খারাপ ছিল তাহা তাহার জীবনের কার্য্যপ্রণালী দেখিলেই বুঝা যায়।

বেচারী ইতি—

পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই নিশ্চিত জানিতেন এবার নিশ্চয়ই পুত্রসন্তান জন্মিবে, কেন না অত বড় জ্যোতিষী মহেশ আচার্য্যের কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। মহেশ আচার্য্য কাশীর বিখ্যাত জ্যোতিষী, তিনি নাকি মানুষ দেখিয়াই তাহার অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন।

গত পূজার সময় কাশীতে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ এই জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি হাত গণিয়া দেখেন নাই, কোষ্ঠী দেখেন নাই, একবার মাত্র ইতির মাকে দেখিয়াই নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন, পুত্র আসিতেছে।

আর সকলের কথা মিথ্যা হইতে পারে, মহেশ আচার্য্যের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, গ্রামের প্রাচীনা রায়গৃহিণী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "ওগো, ওঁর কথা বেদবাক্য, কোনদিন কেউ মিথ্যে বলতে পারে নি। তোমরা হাতে হাতে প্রমাণ পাবে, সত্যি ছেলে আসছে কি না।"

ভবিষ্যদ্বংশীয় যে মহাত্মা আসিবেন তাঁহার নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া রহিল এবং ইহা লইয়া পিতামাতার মধ্যে বেশ একটু মনান্তরও হইয়া গেল। পিতা নাম রাখিতে চান ইন্দ্রজিত, মাতা বলেন সুষীম; শেষ পর্য্যন্ত মায়ের জিদই বজায় রহিয়া গেল।

এত উদ্যোগ, এত আশা, এত ব্যাকুলতা সব এই মেয়েটা আসিয়া ব্যর্থ করিয়া দিল। জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হইয়া গেল, তথাপি তিনি কাশী হইতে পত্র দিলেন কেমন করিয়া যে মেয়েটা আসিল তাহা তিনি ভাবিয়া পান না, যেহেতু পুত্র আসিবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ ছিল এবং মেয়েটা কোন মুহূর্ত্তে এতটুকু ফাঁক পাইয়া যদি তাহার যাত্রাপথে আসিয়া না দাঁড়াইত—সে আসিতই। তাঁহার গণনা এ পর্য্যন্ত মিথ্যা হয় নাই, এই ক্ষুদে মেয়েটা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকেও রীতিমত ফাঁকি দিয়াছে, কেবল তাহার পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনকেই ফাঁকি দেয় নাই।

পিতা মহিম মুখোপাধ্যায় কন্যার মুখদর্শনও করিলেন না, মা লক্ষ্মীমণি প্রথমটায় অবহেলা দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটাকে কোলে লইয়া দুধ দিতেই হইল। পিতামাতার মনে প্রকাণ্ড একটা ধারণা জন্মিয়া রহিল, সত্যই এই ক্ষুদে

মেয়েটা ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, ভাবী বংশধর ক্ষুণ্ণ মনে আবার কোথায় স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়াছে কে জানে।

ইতি কিছুই বুঝিল না, শিশু যেমন কাঁদে হাসে খেলা করে, তেমনি হাসিয়া কাঁদিয়া খেলিয়া সে বড় হইতে লাগিল।

অপরাধ কাহারও নহে, মেয়েটার অদৃষ্টের।

মহিম মেয়েজাতটাকে দুইচক্ষু দিয়ে দেখিতে পারিতেন না। নেহাৎ সংসার করিতে হয় বলিয়াই বিবাহ করা এবং একটি মেয়েকে ঘরের গৃহিণী পদ দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীকে হয় তো ভালোও বাসেন, কিন্তু তাঁহার মনের সেই নিদারুণ বিদ্বেষ-ভাবটা সে বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় নাই।

স্ত্রী লক্ষ্মীমণি নেহাৎ গোবেচারা ছিলেন না, জোর করিয়া বিবাদ করিয়া তিনি মহিমকে পর্য্যন্ত সময় সময় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। তবু ইহাও মহিম সহ্য করিতেন কারণ মেয়েদের এ প্রকৃতি দেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে মাসে মাসে তাঁহাকে যাইতে হইত, সেখানে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের অবাধ চলাফেরা দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাহার উপর তাঁহার জনৈক বন্ধু যখন শুনাইয়াছিলেন,

একদিন এইরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা বাংলার ঘরে ঘরে আসিবে, পল্লীর মেয়েরাও এইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে অবাধে চলাফেরা করিবে, আবশ্যক হইলে মারামারিও করিবে, এবং সেদিনের যে আর বিলম্ব নাই তাহাই দেখাইবার জন্য একখানি বই পড়িতে-ছিলেন তাহাতে মহিম একেবারে স্তম্ভিত রাগত, চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

ঠিক এই সময়েই জন্মিল ইতি।

মহিমের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সাত জন্মের পাপ সঞ্চিত না থাকিলে যে কন্যা হয় না, এবং এই কন্যা জন্মিতেই যে তাঁহার মাথা নত হইয়া পড়িল ইহা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন। এই কন্যা বড় হইবে, শিক্ষা না হয় নাই দিলেন তবু বিবাহ তো দিতে হইবে, তখন তাঁহার উচ্চ মহিমা ধূলিসাৎ হইবেই, কৌলিন্যের গর্ব্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

লক্ষ্মীমণির হইল বড় মুস্কিল।

হাজার হোক তিনি মা, সন্তানের উপর অজ্ঞাতে মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চিত থাকিবেই। মেয়ে হাসিলে মুখ বিকৃত করিয়া বলেন, "পোড়া কপাল, পোড়ার মুখে হাসি দেখ, মরণ আর কি—"

কিন্তু তবু দেখিতে ভালো লাগে, তবু তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখেন, মুখের বিরক্তিভাব কখন আস্তে আস্তে মিলাইয়া গিয়া জাগিয়া উঠে স্মিত কোমল এতটুকু হাসির রেখা।

এক একদিন এমনও হয়, ছোট্ট মেয়েটি বেশ খেলা করে, মা তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকেন, সে হাসিলে হাসেন, কাঁদিলে তাড়াতাড়ি বুকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা দেন, ঠিক সেই সময়েই হুড়মুড় করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া পড়েন।

সামনের দৃশ্যটা কিছুতেই তাঁহার মনোরঞ্জন করে না, তাঁহার সারা চিত্ত দারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে, মুখখানার উপর সে চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। বিকৃত মুখে তিনি বলিয়া উঠেন, "আঃ মাটির ঢিপিকে আবার আদর হচ্ছে।"

জননী অত্যন্ত সন্ত্রস্তা হইয়া উঠেন।

এইভাবেই লুকোচুরি চলে।

লক্ষ্মীমণি আস্তে আস্তে নরম হইয়া পড়িলেন, আর মহিম সেই পরিমাণেই উগ্র হইয়া উঠিলেন। মা তখন কন্যাকে তাঁহার চোখের আড়ালে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখেন।

তিনটি ছেলে—

তাহারাও ঠিক পিতার মনের ভাবটি পাইয়াছে। ভ্রূভঙ্গী

করিয়া পরেশ বলে, "এঃ, একটা মেয়ে হয়েছে দেখ, দিন রাত খালি চেঁচাচ্ছে।"

নরেশ বলে, "ইচ্ছে করে গলাটা টিপে দিই।"

রমেশ চুপ করিয়া থাকে, অথচ হিংসা করিবার কথা তাহারই, কারণ মেয়েটা আসিয়া তাহাকেই মায়ের কাছ ছাড়া করিয়াছে। বড় দুই ভাই অনেক আগেই মায়ের সংস্পর্শ এড়াইয়া পিসিমার কাছে আশ্রয় লইয়াছে, একদা রমেশই মায়ের আদরের গোপাল ছিল। এই মেয়েটা আসিবামাত্র রমেশ তফাৎ হইয়া গিয়াছে, দূর হইতে আড়চোখে সে কেবল তাকাইয়া দেখে।

অবহেলা ঘৃণার মধ্যেও মানুষ বাড়ে।

ইতিও বাড়িল, বাড়িলও একটু অস্বাভাবিক রকমে। যখন তাহার বয়স তের বৎসর তখন কেহ দেখিয়া বিশ্বাস করে না।

আর কিছু না থাক্, কৌলিন্যের গর্ব্ব মহিমের অন্তরে খুব বেশী রকমই ছিল; পাছে এই নিখুঁত বংশে এতটুকু কলঙ্ক পড়ে এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা অস্থির হইতেন।

যত ক্রোধ সব পড়িল ইতির উপর।

মেয়েটা তালগাছের মত বাড়িয়া উঠিতেছে। উহার দিকে

তাকাইলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়, মনে হয় কি করিয়া জাত মান রক্ষা হইবে, স্ব-ঘরে কন্যা দান করা যাইবে ?

উপযুক্ত ঘরও মিলে না। আজকাল সব ছেলেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত, তাহাদের টাকাও চাই তেমনি। মেয়ের সৌন্দর্য্যের পানে কেহ চাহিবে না, চাহিবে তাহার পিতার সিন্দুকের পানে।

পত্নীকে ডাকিয়া বলিল "মেয়েটাকে বসিয়ে খাইয়ো না, দিন দিন মোটা হাতী হয়ে উঠছে।"

বেচারা ইতি যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহার বড় বড় দুইটি চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে, কোনমতে সে নিজেকে গোপন করিয়া রাখে।

সে সেই বাল্যে যা খেলা করিয়াছে। জ্ঞান হইয়া অবধি আর খেলা করে নাই। সে বুঝিয়াছে সংসারে সে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, তাহার অধিকার এখানে নাই।

মহেশ আচার্য্যের গণনার কথা শুনিয়াছে তাই নিজেকে সে ধিক্কার দিত।

দিনরাত সে সংসারের কাজ করে, অসুখ হওয়া মহাপাপ বলিয়া ভাবে।

রমেশ সম্প্রতি গ্রাম্য স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া সহরে

আই-এ পড়িতে গিয়াছে। শরীরে তাহার নিত্য অসুখ, কোন ক্রমে যেন সে বাঁচিয়া আছে। সেইজন্য প্রায়ই সে বাড়ী চলিয়া আসে।

পিতা ইতির পানে চান, দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলেন, "মেয়ে কিনা, কেমন শরীরটি দেখ, আর রমেশ যে ছেলে, ওর ওপর নির্ভর করতে হবে কি না, সেইজন্যেই ওর শরীর ওই রকম।"

ইতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যেন সে রুগ্ন হয়, তাহার ছোড়দা যেন ভালো হইয়া উঠে। কিন্তু ভগবান তাহার প্রার্থনায় কাণ দেন না, সে দিন দিন বড় হইতেই থাকে, গায়ের রং দিন দিন উজ্জ্বল হইতে থাকে।

অনেক পাত্রের পিতা দেখিতে আসেন। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হয় কিন্তু পাওনা শুনিয়া পিছাইয়া যান, একবার দেখিয়া গিয়া আর আসেন না, কোনও সংবাদও দেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসরও চলিতে লাগিল। পরেশ ও নরেশ কলিকাতায় কাজ করিতে লাগিল, রমেশ পড়িতে লাগিল, ইতি ঘরের কোণে পড়িয়া রহিল।

অবশেষে বিবাহ হইল।

হারাণো-স্মৃতি

বয়স তখন ঠিক ষোল বৎসর।

পাত্রের বাড়ী রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, জমি জমা আছে, কোনক্রমে সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবে, চাকরী না করিলেও দিন চলিবে।

বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্প্রতি গতায়ু হইয়াছে, সন্তানাদি কিছু নাই। হয় তো তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, নেহাৎ বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে হইয়াছে, কেন না ঘরে সব থাকিলেও রাঁধিয়া দিবার অভাবে বেচারাকে উপবাসে প্রায় দিন কাটাইতে হইত।

বাংলা দেশের মেয়ে—বিশেষ এ রকম রক্ষণশীল ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিতেই হইবে তা সে যাহাকেই হোক। কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বোবা—এ নির্ব্বাচনের ভার মেয়ের নাই, নির্ব্বাচন করিবে মেয়ের অভিভাবক। যে কেহই আসুক—তাহার হাতে মেয়েকে হাত রাখিতেই হইবে, সে চরিত্রহীন হোক মাতাল হোক—তাহাকে নাকি দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেই হইবে।

শুভদৃষ্টির সময় ইতি পূর্ণভাবেই তাকাইল। স্বামীর কুৎসিত আকৃতির পানে তাকাইয়া একটুও ভাবান্তর তাহার হইল না,

নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই সে নিজেকে সেই লোকটির হাতে সমর্পণ করিল।

লোকে বলিল, "মাগো, মেয়েটাকে হাত পা ধরে জলে ফেলে দিলে গা। অমন সুন্দরী মেয়ে—ওকে রাজার ঘরে মানাত—"

ইতি কিছুই ভাবিল না, বলিল না, শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় একটি ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না।

মা গোপনে চোখের জল মুছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য অন্তরে একটা বেদনা অনুভব করিলেন, তখনই জোর করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন—যাক, সেখানে গিয়া সুখী হোক। এখানে যা কষ্ট, লাঞ্ছনা—

পিতা আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হুঁকায় টান দিয়ে বলিলেন "বাঁচা গেল, ঘাড় হতে একটা বিরাট বোঝা নামল।"

কন্যাদায় বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ দায়, পিতৃমাতৃ দায় হইতেও বড়।

গৃহস্থ মেয়ের শ্বশুর বাড়ী সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, ইতির শ্বশুরবাড়ীও সেইরূপ।

দুখানি খড়ের ঘর, মাটির দেয়াল, মেঝেও মাটির। প্রতিদিন লেপিতে হয়, তিন চারবার করিয়া ঝাঁট দিলেও পরিষ্কার থাকে না। যেখানে সেখানে বসিবার যো নাই, কাপড় অতি শীঘ্রই ময়লা

হইয়া যায়। পায়ে সযত্নে আলতা পরিলে খানিক বাদেই ময়লা হইয়া যায়, পাঁচ ছয় দিন অন্তর কাপড় সিদ্ধ করিয়া ঘাটে লইয়া গিয়া কাচিতে হয়।

দিন বেশই কাটে।

দয়াল সারাদিন মাঠে ঘোরে, অনেক সময় নিজের হাতে লাঙ্গল দেয়, গরুর সেবা করে, কোমরে গামছা জড়াইয়া বিচালি কাটে। সন্ধ্যার সময় তারণ মণ্ডলের বাড়ীতে আড্ডা বসে, সেখানে সকল জাতের মধ্যে একই হুঁকা চলে, ব্রাহ্মণ কেবল একটা কলাপাতার নল বসাইয়া লয় মাত্র।

রাত্রে স্ত্রী তাহার পদসেবা করে, ফাটা পায়ে তৈল মালিশ করে, গরমকালে বাতাস দেয়। বাংলার প্রতি গৃহে মেয়েরা এমনই ভাবে স্বামীর সেবা করিয়া যায়; ইহাকেই সুখের সংসার বলে।

সাধারণ সকল মেয়েই জানে তাহাদের ঠিক এই ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ধনীর সংখ্যা এদেশে অতি কম। ধনীকন্যা শিক্ষা পায় সহরে বাস করে, দরিদ্র পল্লী-বালা অতি দূরে পড়িয়া থাকে, সহরের আবহাওয়া তাহাদের চিরাচরিত সংস্কার নষ্ট করিতে পারে না।

সাহাদের ঘাটে গ্রামের মেয়েদের দুবেলা বৈঠক বসে।

হারাণো-স্মৃতি

সারাদিন মেয়েরা ভূতের মত সংসারে খাটে, সকাল ও বৈকালে ঘাট জুড়িয়া বসে। কাহার ঘরে কি হইল, কাহার স্বামী পুত্র কিরূপ, কাহার শ্বাশুড়ী দুষ্ট ইত্যাদি আলোচনা চলে এবং এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ঘাটে থাকিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া যায়। ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর বাহিরে যে বিশাল জগৎ আছে সে সংবাদ ইহারা রাখে না, কত আসে কত যায় কে তাহার হিসাব করে?

ইতিও এই দলে বেশ যোগ দেয়, আর পাঁচ জনের মতই আসে, গল্প করে।

সে ধান ভানে, চিঁড়া তৈয়ার করে, বৎসরের জন্য জালা ভরিয়া তুলিয়া রাখে। সংসারের খুঁটিনাটি কত কাজ করে—

ইহারই মধ্যে এতটুকু কাজের ত্রুটি পাইলে দয়াল বড় কম লাঞ্ছিত করে না। কত দিন উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছে, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, আবার যখন রাগ পড়িয়াছে তখন ডাকিয়া আনিয়াছে।

এমনি ভাবে বাংলা মেয়ের দিন কাটে।

পথে চলিতে অপরূপ সুন্দরী মেয়েটীকে এরূপ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া গেল।

হারাণো-স্মৃতি

এ মেয়েটিকে সে কোন দিনই দেখে নাই। অনেক প্রশ্ন করিল, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য্যভাবে অপূর্ব্ব চলিতে চলিতে বার বার চাহিয়া দেখিল।

পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল।

এ মেয়েটী দয়ালের স্ত্রী। ইহার সম্বন্ধে অনেক জন-শ্রুতিই অপূর্ব্বের কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। হাকিম সাহেবের মনের গতি কোন্‌দিকে তাহা লোকে চট করিয়া ধরিয়া লইল এবং তাহার মনস্তুষ্টির জন্য অনেক কথা বলিল।

জরীপ করা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অপূর্ব্বকে শীঘ্রই এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির যে পরিচয় সে পাইল তাহাতে তাহার অন্তর দ্রব হইয়া গেল, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিল—আহা! কিন্তু এই ক্ষুদ্র সহানুভূতির ভাবটুকুই তাহার সমস্ত অন্তর শীঘ্রই ছাইয়া ফেলিল, ক্ষুদ্র যে-কীট কোন অতর্কিত ফাঁকে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভিতরটা কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া ক্রমেই মোটা হইয়া উঠিল।

সে চিন্তার শেষ নাই, সে চলিয়াছেই।

সেদিন নদীর ধার হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অপূর্ব্ব

আবার সেই মেয়েটিকেই দেখিতে পাইল। যে দারুণ রৌদ্রে লোকে বাহির হইতে পারে না সেই রৌদ্রে সে চুপ করিয়া তপ্ত বালুর উপর দাঁড়াইয়া উদাসনেত্রে কোন্‌দিকে চাহিয়া আছে কে জানে!

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল।

হাতে আজ শাঁখা দুগাছিও নাই, কাপড়ের লাল দুইটী পাড় নাই, সীঁতায় সিঁদুরও দেখা যায় না।

নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচার আজ চরমে পৌঁছাইয়াছে। জোর করিয়া সে ইহার শাঁখা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লাল দুইটি পাড় ছিঁড়িয়া কাপড়খানিকে বীভৎস করিয়া দিয়াছে, ললাটের সিঁদুর মুছিয়া শেষটায় তাহাকে টানিতে টানিতে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে।

ডেপুটী সাহেবের মনের ভাব নাকি সে জানে, সেই জন্মই নির্দ্দোষী স্ত্রীর এই শাস্তি।

হয়তো দূরের পানে তাকাইয়া সে সম্মুখেই চলিতেছে, এমনই অন্যমনস্ক ভাবে কখন ঝুপ করিয়া জলের মধ্যে পড়িবে—এই-ই তাহার বাসনা।

অপূর্ব্বর পদশব্দ পাইয়া সে চোখ নামাইল।

আজ সে চোখের উপর ঘোমটা টানিল না।

অপূর্ব্ব ডাকিল, "আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় তোমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ইতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, হাত তুলিয়া নদীর জল দেখাইয়া বলিল, "বাপের বাড়ী নয়, ওইখানে যাব।"

অপূর্ব্ব শুধু হাসিল, "পাগল! মরবার কল্পনা ক'রো না। জগতে তোমার জায়গা আছে, শুনেছি তোমার বাপ মা তিন ভাই আছে, তারা তোমায় জায়গা দেবে, আমার সঙ্গে এসো।"

সংসার আবার ডাকে।

ইতি মরণের কথা ভুলিয়া গেল; মনে হইল তাহার স্থান আছে, তাহার মা আছে।

সে শিহরিল।

অন্য ঘরে ইতি থাকে।

কদাচিত বাহির হয়,—অপূর্ব্ব তাহাকে দেখিতে পায়। দিনের বেলায় কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না, ইতি তখন কোথায় ডুবিয়া থাকে।

যত ভাবনা আসে রাত্রে।

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব জানালার মধ্য দিয়া তাকাইয়া থাকে ইতির ঘরের রুদ্ধ দরজার পানে।

ও-ঘরে কে আছে সে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, না জাগিয়া

আছে? সম্ভব ঘুমায় নাই, তাহারই মত জাগিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে, কত কি ভাবিতেছে।

সে কি ভাবিতেছে কে জানে? সেই চাষার মত লোকটার কথা, না পিত্রালয়ের কথা? এ ঘরে যে রহিয়াছে, যাহার জন্য স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহার কথা কি একটিবার ভাবে না?

মাথার মধ্যে সব অগোছালো হইয়া যায়, চোখে ঘুম আসে না, অপূর্ব্ব ঘরে পায়চারী করে।

দয়াল কাল আসিয়াছিল, অপূর্ব্ব হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। স্ত্রী তো দিবেই না, উপরন্তু সে যে স্ত্রীর উপর এত অত্যাচার করিয়াছে, সে জন্য নালিশ করিবে ভয় দেখাইয়াছে।

অশিক্ষিত গ্রাম্যপ্রকৃতি লোকটি হাকিমের তাড়া খাইয়া ক্ষুদ্র শিশুর মতই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, বার বার হাত দুখানা জোড় করিয়া বলিয়াছিল, "মাপ করুন হুজুর, আর কখনই অমন করব না, ওকে বরং জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে কেবল মাথা নাড়িয়াছিল।

অসহায় লোকটী তখন বলিয়াছিল, "আচ্ছা হুজুর, আমার পরিবারকে বরং একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে আমায় ভালবাসে কিনা। আজ পাঁচ বছর তো বিয়ে হয়েছে হুজুর,

এমন কত ব্যাপার কতদিন ঘটেছে, তবুও তো আমায় ছেড়ে কোথাও যায় নি। আপনি তাকে আমার সামনে একটিবার আসতে দিন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি; যদি সে না যেতে চায় আমি চলে যাব, তাকে আমি আর বিরক্ত করব না।"

হয় তো তাহার মনে আশাটুকু ছিল—পাঁচ বৎসর ধরিয়া এ রকম নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও যে তাহার ঘরে টিকিয়া ছিল, সে আজও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। একবার সামনে আসিয়া স্বামীর মুখখানা দেখিলেই বিচলিত হইয়া পড়িবে, হাকিম বাবুর তর্জ্জন গর্জ্জন তখন সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

অপূর্ব্ব একটু ভাবিয়া বলিল, 'রোস, তাকে আমি তোমার কথা বলে দেখি।"

নারীচরিত্র নাকি সে বুঝিতে পারে না। এখন নিতান্ত মিথ্যা লইয়া কারবার চলিতেছে, আশা এখনও আছে, কিন্তু লোকটাকে তাড়াইয়া দিলে যদি বিপরীত ফল হয়, এই একটা ভাবনা ছিল।

ইতি শুনিল দয়াল তাহাকে লইতে আসিয়াছে।

ঘৃণায় দুঃখে ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, সে মাথা

নাড়িয়া বলিল, "আমি ওখানে আর যাব না, মার কাছে যাব।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "সে একবার দেখা করতে চা'চ্ছে।"

ইতি এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমি দেখা করব না, হাকিম সাহেব।"

আসল কথা, প্রত্যহ এই পাঁচ বৎসর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া লোকের ঠাট্টা পরিহাস শুনিয়া সে এমন কঠিন হইয়াছে। তবু সে তাহার সেই স্বামীকেই একটু ভালোবাসিত, স্নেহ করিত—অপূর্ব্ব তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া মুখের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিল, অন্তরের কৃতজ্ঞতা পায় নাই। ইতি এখন স্বামীকে দেখাইতে চায়, সে রাগ করিতে জানে, সেও ফিরাইয়া আঘাত দিতে পারে।

অপূর্ব্ব বাহিরে আসিয়া দয়ালকে জানাইয়া দিল, ইতি দেখা করিবে না, সে চলিয়া যাইতে পারে।

দয়াল আবার কাঁদিবার উপক্রম করিতে অপূর্ব্ব তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া কম্পাউণ্ডের বাহির করিয়া দিতে জনৈক কনষ্টবলকে আদেশ করিল।

আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল।

বৎসর দুই হইল পিতা মহিম মন্ত্র লইয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কমণ্ডলু চিমটা লইয়া সকালের দিকে নদীর ধারে একটা গাছের তলায় সমাধিতে বসেন, গ্রামের সকল লোক ভক্তিপ্লুত অন্তরে প্রণাম করে। বাড়ীতে ত্রিতলের ছোট ঘরটিতে প্রাণায়াম করেন, সারাদিন গীতা বেদ উপনিষদ পাঠ করেন।

লোকে ধন্য ধন্য করে।

সকলেই বলে, মহিম কোনও পাপে ধরায় আসিয়া দিনকত সংসারে জড়াইয়াছিলেন, ভগবান তাঁহার ভক্তকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

দলে দলে কত লোক আসে, প্রণাম করিয়া পাদোদক লইয়া নিজেদের ধন্য মনে করে।

দুই পুত্র কাজ করে, দুই পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। লক্ষ্মীমণি কর্ত্তার সেবা করেন, সংসারের কিছুই দেখেন না। রমেশ দুইবার বি-এ ফেল করিয়া কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

জামাতার আঁকা বাঁকা লেখা পত্র খানা আসিয়া যেন বারুদের স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দিল।

কর্ত্তা সগর্জ্জনে বলিলেন, 'আমি তখনই বলেছিলুম না গিন্নি, আঁতুড়েই মেয়ের গলায় পা দাও কিম্বা খানিকটা হ্নন খাইয়ে মার? অ্যাঁ, বংশে একেবারে কালি দিলে মুখ দেখাবার পথ রাখলে না?"

লক্ষ্মীমণি পাথর হইয়া গেলেন।

কথাটা বিশ্বাস হয় না যে তাঁহারই কন্যা, সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কন্যার লাঞ্ছনার কথা মায়ের কাছে অজ্ঞাত নাই। পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটিবার সে এখানে আসে নাই। ছেলেরা বাড়ী আসে, বউয়েরা থাকে, বাড়ী আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে; মা সকলের সামনে হাসেন, কিন্তু গোপনে সমস্ত বুকটা জুড়িয়া হাহাকার জাগে, গোপনে তিনি দুটি ফোটা চোখের জল ফেলেন।

স্বামীকে একটিবার মাত্র ইতির কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়াছিলেন, সে কথা মনে আছে।

দুই ভাই বিকৃত মুখে বলিল, "হতভাগিটা মুখ দেখানো বন্ধ করলে, লোকে বলবে কি?"

কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিবার সত্ত্বেও সমস্ত গ্রামে

রাষ্ট্র হইয়া গেল ইতি কুলত্যাগ করিয়াছে। ভাইয়েরা লজ্জায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

ইহারই দুদিন পরে গরুর গাড়ীখানা দরজায় আসিয়া থামিল এবং তাহারই মধ্য হইতে নামিল ইতি—

লক্ষ্মীমণি তরকারী কুটিতেছিলেন, কানে আসিল ইতি আসিয়াছে, তিনি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পিতার কানে কথাটা যাইতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন।

কুলত্যাগিনী কন্যা বাড়ী আসিয়াছে।

হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনি মারেন আর কি—

হিন্দী বাংলা ইংরেজী মিশাইয়া তিনি অজস্র চীৎকার করিতে লাগিলেন—মোট কথা, "আবি নিকালো, এক সেকেণ্ড এ বাড়ীতে থাকা চলবে না।"

ইতি স্তম্ভিত।

সে বুঝাইয়া বলিতে চায়—তাহার স্বামী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে তাই এখানে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার কথা শুনিবে কে?

পিতা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি সব শুনেছি, সব জানি। দয়ালের কাছে আবার যদি জায়গা পাস, আমি নিজে গিয়ে তোকে নিয়ে আসব। আর যদি না পাস, জলে

ডুবে মরিস, বেঁচে থেকে আমার মুখ যেন হাসাস নে, তোকে এই শেষ কথা বলে রাখলুম, মনে রাখিস।”

ইতি স্থির হইয়া দাঁড়াইল, পিতার কথা শুনিল।

মাকে দূর হইতে একটা প্রণাম করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, ‘যদি সেখানে আশ্রয় পাই আমায় আনবে তো মা?”

গোপনে চোখের জল মুছিয়া জননী বলিলেন, “আনব, তখন তোর সব কথা শুনব, আজ কিছু শুনব না, শুনতেও পারব না।”

ইতি গাড়ীতে উঠিল।

আশ্রয়? কোথায় আশ্রয়, কে দিবে আশ্রয়?

এখানে নাই, সেখানেও হইবে না, তবে—?

ইতি চক্ষু বুজিল।

মুখভঙ্গী করিয়া দয়াল বলিল, “কেন—হাকিম বাবু জায়গা দিলে না, তাড়িয়ে দিলে বুঝি?”

গম্ভীর কণ্ঠে ইতি বলিল, “না তিনি তাড়িয়ে দেন নি তাড়িয়ে দেবেনও না, আমি নিজেই চলে এসেছি।”

দয়াল হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, “অর্থাৎ—?”

ইতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাথা ডুলাইয়া দয়াল বলিল, "এখানে আর জায়গা নেই—হবে না, তুমি যেথানে ছিলে সেইখানেই যাও; কেন আমায় ত্যক্ত কর।"

দৃপ্ত নেত্রে ইতি খানিক তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ধীর পদে বাহির হইল।

অফিস-রুমে একা বসিয়া অপূর্ব্ব নিজের কাজ করিতেছিল।

ইতিকে কাল সে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে।

অন্তরের প্রবৃত্তিকে সে বিজিত হইতে দেয় নাই, এই তাহার প্রধানতম অহঙ্কার। কয়টা দিন সেই প্রবৃত্তিটার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে সমস্ত অন্তরটাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি তাহার বশ হয় নাই, তাহাকে সে বাধা দিয়াছে।

কাল ইতিকে পাঠাইবার সময় সে যথেষ্ট বেদনা পাইয়াছিল, তথাপি সে পাঠাইয়াছে। কাল সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে, নিজেকে শতসহস্রবার ধিক্কার দিয়াছে, সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও আলো পাইয়াছে,—সে গত রাত্রের কথা ভাবিয়া বিবর্ণ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

হারাণো-স্মৃতি

খোলা দরজার পথে ইতি যখন প্রবেশ করিয়া তাহার পায়ের তলায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমায় কেউ জায়গা দিলে না, সবাই তাড়িয়ে দিলে—"

তখন অপূর্ব্ব চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিল।

অশ্রুসিক্ত কি সুন্দর মুখখানি—

মানুষের মন দুর্ব্বল হয়, লুব্ধ হইয়া উঠে।

ছিটকাইয়া পড়া পেনটিকে কুড়াইয়া লইয়া সে ভাবিতে আরম্ভ করে।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করে, "তাইতো কি করা যায়? তা হলে কি করবে ইতি, কোথায় যাবে?"

ইতি একটু নামিয়া বলে, "আপনার বাড়ী নেই হাকিম বাবু, সেখানে আমার জায়গা হবে না? আমি তাঁদের ঝি হয়ে থেকে সব কাজ করব, আপনার ছেলেপুলে মানুষ করব।"

অপূর্ব্বর মুখে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া যায়।

বাড়ী তাহার আছে, সকলেই সেখানে আছে, কিন্তু ইহাকে কেহ স্থান দিবে কি?

সংসার যে কি তাহা ইতি জানেনা, অপূর্ব্ব জানে, অনেক সংবাদই সে রাখে।

খানিক ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, সাতদিন পরে আমার কাজ হয়ে যাবে, আমি বাড়ী যাব। তখন না হয় দেখা যাবে; এখন এই সাতদিন তুমি এখানে থাকো।"

ছদিন মাত্র গেল, তৃতীয় দিন ইতিকে আর দেখা গেল না। উৎকণ্ঠিত অপূর্ব্ব চারিদিকে লোক পাঠাইল, দয়ালকে ধরিয়া আনিয়া অনেক নির্য্যাতনও করিল, ইতির সন্ধান মিলিল না।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি জরীপ শেষ করিয়া সে একদিন বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

অনেক দিন পরের কথা।

অপূর্ব্ব আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

সাত বৎসর পূর্ব্বে জরীপ করিতে গিয়া কোথায় একটী সুন্দরী মেয়ে বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহার আশ্রয়ে দিনকতক বাস করিয়াছিল এবং কয়টা দিন তাহাকেই লইয়া চিন্তায় গোপনে সে কত খেলা করিয়াছে আজ তাহা মনে পড়ে না।

অপূর্ব্ব ভারি কড়াপ্রকৃতির হাকিম, বাড়ীতেও তেমনি উগ্রপ্রকৃতি।

অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বে এই লোকটিই ছিল দিব্য অমায়িক, অত্যন্ত মধুরপ্রকৃতি। পরিবর্ত্তনটা কবে কেমন করিয়া ঘটিল, সে সংবাদ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব ভুলিয়া গেছে।

হয় তো অতীতের কথা ভাবিলে মনে হয়, কিন্তু সে অতীতকে ভুলিয়া গেছে, পূর্ব্বে যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব ছিল, আজ তাহাদেরই সে চিনিতে পারে না।

সে দিন ছিল রবিবার—

বন্ধুদের নিতান্ত আগ্রহে তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া অপূর্ব্বকেও লেকে যাইতে হইয়াছিল।

লেকের কালো জলে নানা আকারের বোট ছুটিতেছিল, দলে দলে লোক লেকের চারিধারে বেড়াইতেছিল।

একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল একটি মেয়ে, তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটা শিশু।

চলিতে চলিতে যেন হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া গেল, বিস্মিত দুটি চোখে সে মেয়েটির পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকদিনের হারানো একটি দিনের স্মৃতি তাহার মনটাকে দোলা দিয়া যায়।

কবে—কোনদিন সে এই মুখখানাই দেখিয়াছিল ?

তাহার পর কতদিনই আসিয়াছে, কতদিনই চলিয়া গেছে,

সে হিসাব অপূর্ব্ব রাখে নাই, রাখিবার চেষ্টাও করে নাই।

তুনিয়া অনেক জিনিষই তাহাকে দিয়াছে, সে পায় নাই কি? বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ,—তাহার পর স্ত্রী পুত্র কন্যা, সবই সে পাইয়াছে, চাহিবার জন্য তাহার আর কিছুই নাই।

কিন্তু না চাহিতে যাহা আসিয়াছিল—

তাহা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে,—তাহার জন্য সে অভাব অনুভব আজও বোধ হয় করে। অন্তরের অন্তরালে আজও সে স্মৃতি আছে, নহিলে তাহারই মত কাহাকেও দেখিয়া অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় কেন?

সে দিনে আসামীর ডকে আসিয়া যে মেয়েটি দাঁড়াইল, তাহার পানে তাকাইয়া অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ সেই মেয়েটি যাহাকে কাল সে লেকের ধারে দেখিয়াছিল।

সেও তাকাইয়াছিল। অপূর্ব্ব তাহার পানে তাকাইতেই সে হাসিয়া ফেলিল। অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইল।

মেয়েটি নাকি চুরি করিয়াছে। শুনা গেল ইহার পূর্ব্বেও সে অনেকবার এই কাজ করিয়াছে এবং প্রায় প্রতিবার শ্রীঘর দর্শন করিয়া আসিয়াছে।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সে নির্ভীকভাবেই জানাইল

চুরি না করা ছাড়া উপায় কি ? যেমন করিয়াই হোক তাহাকে দিন যাপন করিতে হইবে তো ; একটি মেয়ে আছে, তাহাকে আহার্য্য দিতে হইবে, স্বামীর দুখানা পা কবে ট্রেণে কাটা গিয়াছে তাহাকে আহার্য্য দিতে হইবে, ভিক্ষা চাহিলে পাওয়া যায় না দেখিয়াই সে চুরি করে এবং ইহার পরও সে আরও চুরি করিতে পারে কারণ তাহাদের তিনটি প্রাণীর জীবিকার্জ্জনের কোনও উপায় নাই।

"তোমার স্বামী—?"

মেয়েটী মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "হ্যাঁ, আমার স্বামী।"

বিচার ঠিকমতই হইল এবং ছয়মাসের জন্য তাহার জেলের আদেশ হইল।

হাসিতে হাসিতে সে নামিয়া চলিল, "বাঁচলুম বাবা, ছ'মাসের আহার যোগানোর ভাবনা আমায় ভাবতে হবে না। যার যা হবে হোক গিয়ে, আমি তো ছ'মাস আরাম করে থাকি গিয়ে। হাকিমবাবু যদি চিরকালের মতই জেলে থাকতে দিতে গো তা হলে সত্যি তোমায় মন খুলে আশীর্ব্বাদ করতুম।"

অপূর্ব্ব বিস্মিত চোখে মেয়েটির পানে চাহিয়া রহিল। ইহার কথাবার্ত্তা চলাফেরা সবই সেই মেয়েটির মত।

কিন্তু সে যে ছিল গৃহস্থঘরের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বধূ। ইহার

মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে তাহা তো ছিল না। সেই শান্ত সংযত ভাব, সে তো ইহার মধ্যে নাই।

অন্ধকার গলি—

দূরে দূরে এক-একটি আলো জ্বলিতেছে, তাহাতে অন্ধকার দূর হয় নাই।

অপূর্ব্ব মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারকে বলিল, "দশ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি আসছি।"

সাত নম্বরের বাড়ী, মেয়েটি বলিয়াছিল এখানেই সে থাকে।

মনের উৎকণ্ঠা যায় নাই, তাহার সম্বন্ধে সে সবিশেষ জানিতে চায়, কোর্টে জানার সুযোগ হয় নাই।

একখানি খোলার ঘর—অন্ধকারে ছাওয়া।

দরজায় বসিয়া একটা লোক—

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল, কি বলিয়া কথাটা তুলিবে সে তাহাই ভাবিতেছিল।

যে মেয়ে চুরি করিয়া আট দশবার জেল খাটে তাহাকে উপলক্ষ করিয়া কথা তুলিতে দোষ কি, সকলেই তো তাহাকে জানে।

একবার কাশিয়া সে অগ্রসর হইল। লোকটি হ্যারিকেনের

আলোটা বাড়াইয়া দিয়া একবার তীক্ষ্ণ নেত্রে তাকাইল, জিজ্ঞাসা করিল 'কি চান বাবু?"

অপূর্ব্ব জানাইল এই বাড়ীতে যে মেয়েটি থাকে তাহাকেই তাহার দরকার।

লোকটি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কাল থেকে বাসায় ফেরেনি বাবু। ভারি বদমায়েস, আমায় জ্বালিয়ে খেলে!"

ইহার পর কথা কহিবার স্বযোগ পাওয়া গেল।

লোকটা সবিনয়ে জানাইল—উহার পরিচয় সে কিছুই জানে না। পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক রকম পাপকাজ করিত। একবার চুরি করিয়া তুইজনেই দণ্ডিত হইয়াছিল, সে খালাস পাইয়া আসিয়াছিল, ইতি আসে নাই। তাহার পরেই রাণাঘাট ষ্টেশনে চুরি করিয়া সে পলাইতে গিয়া ট্রেণে তুখানা পা কাটা যায়।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে—

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করে "ওর নাম কি?"

লোকটি উত্তর দিল, "ইতি।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ে কার, তোমার না তার।"

সে উত্তর দিল, "মেয়ে তার বাবু। সে মেয়েটা কাল চলে গেছে আর আসে নি।"

সেই ইতি

গৃহস্থ কন্যা, গৃহস্থ বধূ—

যে মানুষ হইয়াছিল পুণ্যের আবহাওয়ার মধ্যে। এ জীবন তাহার কল্পনার বাহিরে ছিল, কোন দিন যে সে এ পথে আসিবে তাহা কেহ ভাবে নাই।

কিন্তু তখন যদি সে আশ্রয় পাইত—

যদি অপূর্ব্বও তাহাকে আশ্রয় দিতে রাজি হইত—

সে মরিতে পারিত, একদিন সে মরিতে গিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাকে মরিতে দেয় নাই। সেদিন যে সাহস তাহার মধ্যে ছিল, সে সাহস তাহার মধ্যে আর ছিল না।

মানুষ কোথা হইতে কোথায় আসিতে পারে, সন্দেহ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়, অপূর্ব্ব সে প্রমাণ হাতে হাতে পাইল।

সে কাল রাত্রেও ঘুমাইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানিত, ইতি পৃথিবীতে নাই, সে সকলের ঘৃণা সহিয়া জগতে থাকিতে পারে না।

টলিতে টলিতে অপূর্ব্ব মোটরে উঠিল, তখন তাহার মুখ-খানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শেষের দিকে

প্রিয় সুভা—

অনেক কাল পরে তোর পত্রখানা পেলুম। তুই যে আমায় মনে করে রেখেছিস তাইতে সত্যি আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আশ্চর্য্য হয়ে যাওয়ার কথাই বটে,—কেননা দুনিয়া আমায় চিরকালের জন্যে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর তার কাছে যাওয়ার অধিকারও আমার নেই।

বিশ্বের ঘৃণিতা—পরিত্যক্তা যে তাকে যে কেউ মনে করে রেখেছে আজও—এ কথা ভাবতেও আমার বিশ্বাস যেন হয় না। কেমন করে বিশ্বাস হবে বোন, আমি যে দুনিয়ার বার।

আজ মনে পড়ছে অনেকদিন আগেকার সেই পুরাণো কথাগুলো। আঃ সেই সব পুরাণো কথা মনে করতে আবার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে যায়, আমি একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

আজ এই শরতের প্রভাতে এই জানলাটির কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম বাগানে শিউলি গাছ তলায় ছেলেপুলের মেলা। তখনও সূর্য্যের আলো ধরার গায় এসে পৌছায়-নি, এর মধ্যে

এরা এসে জুটেছে। এখনও গাছভরা ফুল,—টুপটাপ করে দুটি চারটি করে ঝরে ঝরে পড়তে না পড়তে তারা কুড়িয়ে নিচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে মাথার মধ্যে ঝরে পড়া ফুলের শেষ বিদায়ের গন্ধটুকু এসে পৌঁচাচ্ছে, আমায় অতীত স্বপ্নে বিভোর করে তুলেছে।

মনে পড়ছে সেই পুরাণো কথা! তোর বোধ হয় মনে পড়ছে, আমাদের বাগানখানিতে শিউলি ফুলের গাছ তলায় রোজ সকালে আমরা গিয়ে জুটতুম। সেখানে আমাদের ফুল কুড়ানোর হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। হায়রে সেই তুই,—সেই আমি—সেই খেলার সঙ্গীরা আজও কেউ কেউ রয়েছে, কিন্তু সেদিন কোথায় গেল জান?—আজ আমার হাহাকার করে কেঁদে বলতে ইচ্ছা করছে, দিন, তুমি যদি অতীতে মিশে গেলে, দহন করতে স্মৃতিকে রেখে গেলে কেন? হায়, দিনের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্মৃতিও যেত—কেন তা যায় না?

তারপর—কবে সে খেলার দিন চলে গেল, বিয়ে হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হয়ে হঠাৎ আমার সামনে কে যেন দেওয়াল গেঁথে তুললে। যা করতে যাই—চারিদিক হতে নিষেধ বাণী কাণে আসে। খাওয়া, শোওয়া, বেড়ানো এমন কি কথা বলা, হাসি পর্য্যন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ

হয়ে গেল। মাগো, কি সে অসহ্য যাতনা, কি সে অরুন্তুদ ব্যথা, বুক ফেটে কান্না আসত—ওগো, বিধবাকে কি এমনি করে সব রকমে নির্য্যাতিতা করতে হয়? মানুষ সে—বালিকা সে, এমন ভাবে নিষ্পীড়ন করাই কি সমাজের উচিত কাজ?

তবু দিন যাচ্ছিল। সংসারে যদি মা থাকতেন হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই আমি এতটুকু জুড়ানোর স্থান পেতুম। কিন্তু সংসারে ছিলেন সৎমা তিনি নাকি বড় নিষ্ঠাবতী ছিলেন তাই ক্ষুদ্র একটি বালিকাকে আদর্শ বিধবা করে গড়ে তোলবার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমার বাবাও মায়ের কথায় উঠতেন বসতেন বললেই হয়, আমার দারুণ কষ্ট তাঁর অন্তর স্পর্শও করতে পারে নি।

সে একদিনের কথা—তোর কি মনে পড়ে সু, আমার অদৃষ্টে কাল মেঘ যে দিন ঘনিয়ে এল? হায়রে,—কে জানতো সে দিন আমার ভাগ্যের জন্যে কি বহন করে এনেছিল?

অসুস্থ শরীর ছিল জল আনতে যেতে পারছিলুম না, মা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন "বিধবার আবার সুখ অসুখ কি? শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়া যায় তাই সয়, এ বাবা জান তো? যত বসে থাকবে তত কুড়েমি আসবে,—যাও জল নিয়ে এসো।"

এর পর আরও এমন অনেক কথা তিনি বললেন যাতে

'আমার পড়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি গোপনে চোখ মুছতে মুছতে কলসী নিয়ে জল আনতে ঘাটে চললুম। এর পর কি হল তা কেমন করে বলব। আমি অসহায়া অবস্থায়, তুর্দ্দান্তদের আক্রমণ সইতে পারলুম না, কলসিটা গড়িয়ে পড়ে গেল। পাষণ্ডরা আমার মুখ বেঁধে ফেললে। ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলুম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলুম আমি সুসজ্জিত একটা ঘরে শুয়ে পড়ে আছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। একে আমি চিনতুম। এ যুবক আমাদের জমীদার রহমন আলীর ছেলে সুজাত আলি। ভয়ে আমি আবার চোখ বুজলুম। সুজাত আলি বুঝতে পারলে আমি বড় ভয় পেয়েছি। আমায় সাহস দেবার জন্যেই মিষ্ট সুরে সে বললে "তোমার কিছু ভয় নেই। তোমাকে আমার বাগান বাড়ীতে এনেছি। এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।"

আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল, আমি উঠতে যাচ্ছিলুম, সে শশব্যস্ত হয়ে আমার হাতখানা টেনে ধরলে, তুমি উঠো না, তোমার বড় জ্বর এসেছে দেখছি। এখন উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়বে।"

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলুম, "তোমরা কেন আমার এখানে আনলে ?"

সে শান্ত স্বরে বললে, "সংসারে তোমার বড় কষ্ট বীণা, আমি সেই জন্যে—"

"সেই জন্যে আমার সর্ব্বনাশ করতে তুমি আমায় তোমার বাগান বাড়ীতে নিয়ে এসেছ—"আমি হাহাকার করে কাঁদতে লাগলুম।

সুজাত আলি থতমত খেয়ে গেল; একটু থেমে সে বললে, "না, তোমার সর্ব্বনাশ করতে আসিনি বীণা, তোমার ভাল করতেই এনেছি। ছোট বেলায় আমাদের মধ্যে মুসলমান হিন্দু পার্থক্য ছিল না। তোমাদের বাড়ী যখন আমি যেতুম তোমার স্বর্গীয়া মা জাতের বিচার না করে আমায় কোলে টেনে নিতেন, আমার মুখে স্নেহের চুমো দিতেও তিনি এতটুকু সঙ্কুচিতা হতেন না। তুমিও যখন আমাদের বাড়ী আসতে—আমার মা তোমায় বুকে টেনে নিতেন। তোমার মা আমায় চেয়েছিলেন, আমার মা তোমায় চেয়েছিলেন কিন্তু মাঝখানে বিরাট ব্যবধানরূপে দাঁড়িয়েছিল জাতের বেড়া যা পার হওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। জানিনে তুমি আমায় ভালবেসেছিলে কিনা, কিন্তু আমি তোমায় ভালবেসেছিলেম। তোমায় ভালবেসেছি বলে আর কোন নারীকে আমি আজও গ্রহণ করতে পারিনি। আজ তোমায় জোর করে আনার অপরাধে তুমি আমার জাতিকে আমার শিক্ষা

দীক্ষাকে ধিক্কার দিচ্ছো, কিন্তু জেনো বীণা আমি বড় কম কষ্ট পাইনি, তোমার কষ্ট দেখে। তুমি তোমার নিজের নির্য্যাতন সইতে পেরেছিলে, কিন্তু আমি আমার ভালবাসার পাত্রীর লাঞ্ছনা সইতে পারি নি। জানি, আমি মুসলমান বলে আজ তুমি আমায় ঘৃণা করবে,—আজ তোমার কাছে তোমার জাত্যাভিমান শ্রেষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আজ তুমি মুসলমানকে স্পর্শ করে স্নান কর; জানি—আজ আমি যদি বন্ধু ভাবে তোমার পাশে দাঁড়াতে চাইতুম—তুমি বহুদূরে সরে যেতে। তাই—তোমায় লাঞ্ছনা গঞ্জনার হাত হতে বাঁচাতে আমি আমার লোক দিয়ে তোমায় চুরি করে এনেছি।'

আমি থর থর করে কাঁপছিলুম, আমার মুখ হ'তে শুধু একটি মাত্র কথা বার হ'ল, "এখন আমার উপায় ?'

উৎসাহিত সুজাত আলি বললে," তুমি অনুমতি দাও, আমি তোমায় শাস্ত্র মতে আমার সহধর্ম্মিণী করব। আমার বাপ মা আত্মীয় স্বজন এতে অনুমতি দেবেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

আমি তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লুম, রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, "যদি তুমি আমায় যথার্থই ভালবেসে থাকো এমন করে সে ভালবাসার অপমান করো না। আমায় রক্ষা কর—আমায় দয়া

কর, আমায় আমার ধর্ম্ম হ'তে আমার সমাজ হতে এমন নিষ্ঠুর-ভাবে নিয়ো না, আমাকে আমার ঘরে দিয়ে এসো। তোমার পায়ে পড়ি আমায় সেখানে নিয়ে চল।"

তার ঠোঁট দুখানা যেন কি বলবার জন্যেই কেঁপে উঠল, মুখখানা শবের মত মলিন হয়ে গেল, তারপরই সে জোর করে সে মুখে প্রফুল্লতা টেনে নিয়ে এল, ধীর স্বরে বললে, "তাই—তাই হবে বীণা; তোমায় বড় ভালবাসি বলেই তোমার অমতে কিছু করব না। আমি তোমায় নিজে সঙ্গে করে দিয়ে আসব, তুমিও লাঞ্ছনা সইতে আবার সেখানে যাবে,—কিন্তু একটা কথা—তোমার সমাজ তোমায় গ্রহণ করবে তো?"

মাথাটা ঘুরে উঠল, আমি নীরবে শুয়ে পড়লুম। সে বলে চলল, "আজ কালকার দিনে মেয়েরা নির্য্যাতিতা হচ্ছে; যে কোন লোকেই করুক নাম হবে এক জনেরই। এই সব নির্য্যাতিতা মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমিই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, তাই ভাবছি, এতক্ষণ তোমার গ্রামে হুলুস্থূল পড়ে গেছে; তোমার ঘরে স্থান হবে কি?

আমি দুইহাতে মুখ ঢেকে আর্ত্তভাবে বলে উঠলুম, "হ্যাঁ হবে, বাবা আমায় নিশ্চয়ই নেবেন। আমার তো কিছুই হয় নি, আমি তো কিছুই খাইনি, তবে নেবেন না কেন?"

হারাণো-স্মৃতি

হায় রে, যাদের ছুঁতে না ছুঁতে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, অমনি যারা পতিতা শ্রেণী মধ্যে স্থান পায়, সমাজ তাদেরই একজনকে মুসলমানে হরণ করে নিয়ে গেলেও আবার গ্রহণ করবে এ বিশ্বাস আমার কতখানি ভুলের পরে প্রতিষ্ঠিত তা পরে দেখতে পেয়েছিলুম।

সুজাত আলি বড় করুণ হাসি হাসলে, তখন বুঝতে পারিনি কতখানি ব্যথা তার হাসির গা হ'তে ঝরে পড়েছিল। সে বললে "আজ থাক, তোমার বড় জর এসেছে, কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাব। গোল যা হওয়ার তা কাল তোমায় আনার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে, আর বিশেষ কিছু হবে না।"

আমি ব্যগ্র হয়ে বললুম, "আমি আজই—এখনই যাব। তোমার এ ঘরে আমি থাকতে পারছিনে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়ে হঠাৎ সামলে নিলে।

তখনই তার পাল্কীতে আমায় সে উঠিয়ে দিলে, তারপর বেহারাদের আদেশ দিলে আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ব্যাপার কি ঘটে দেখে তারপর যেন তারা আসে।

উঃ, সে কি ভীষণ ব্যাপার, মনে হলে আজও আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আমার কাণ দিয়ে আগুন ছুটে যায়। দেখতে

দেখতে আমাদের বাড়ীর উঠানটা দেশের গণ্য মান্য লোকে ভরে গেল, আমার বাবা বাড়ীর মধ্য হতে মায়ের উপদেশ নিয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভীষণ আস্ফালন করতে লাগলেন—মুসলমান যাকে নিয়ে গেছে তাকে তিনি কিছুতেই আর স্থান দেবেন না। দেশের লোক বাবার এই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে জানাতে গেলুম আমি নির্দ্দোষী, আমায় মুসলমানে হরণ করলেও আমার গায়ে হাত পর্যান্ত দেয়নি, কিন্তু কে আমার কথা কাণে তুল্‌বে?

স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেল আমায় আর ঘরে উঠতে দেওয়া হবে না। আমি সেখানেই বসে রইলাম। একতরফা বিচার শেষ করে কর্ত্তারা একে একে প্রস্থান করিলেন, বাবা ভিতরে ঢুকে দরজায় তিনটে খিল এঁটে দিলেন—প্রবেশ নিষেধ।

একবার আকাশ পানে চাইলুম, একবার স্বর্গগতা জননীকে ডাকতে গেলুম—মা—"

চোখের জল আর বাঁধা রইল না, শ্রাবণের ধারার মত ঝর ঝর ঝরে পড়ল।

বেহারাদের সর্দ্দার অছিমুদ্দি এগিয়ে এল, রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আর এখানে কেন মা,—তোমার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। খোকা

সাহেবের হুকুম—যদি তোমার জায়গা না হয়, তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তুমি যেতে না চাইলে আমি তিনজন বেহারার সাহায্যে তোমায় জোর করে নিয়ে যাব, এ তার হুকুম।”

তখন আমার ভবিষ্যৎ ভাববার সময় ছিল না। অছিমুদ্দি আমার হাত ধরে পাল্কীতে তুলে দিলে, আমি শুয়ে পড়লুম।

তার শান্তি ছিল না, উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সে পথের পানে তাকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অছিমুদ্দি আমায় ধরে আবার সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেই বিছানায় আমি শুয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলুম।

একজন যে আমার চেয়েও বেশী ব্যথা বুকে ঠেলে আমার পাশে পাষাণ মূর্ত্তির মতই বসেছিল তার দিকে আমি চাইনি। আমি কেঁদে আমার জমাট ব্যথাকে অশ্রুর আকারে বার করতে পেরেছিলুম, সে তাও পেরেছিল না। আমার দুঃখে সান্ত্বনা মিলেছিল আমি স্বইচ্ছায় সব হারাতে বসিনি, তার দুঃখে সান্ত্বনা ছিল না,—সে মুহূর্ত্তের উত্তেজনা দমন করতে না পেরে আমায় এনে আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

আমার যখন তার পরে চোখ পড়ল তখন আমি উঠে বসলুম:

“পৃথিবীতে আমার কোথাও জায়গা রাখলে না, তবে তোমার বাসনাই পূর্ণ হোল, নাও তুমি,—আমাকে গ্রহণ কর—।”

হারাণো-স্মৃতি

তার দিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম।

সে আমার হাত দুখানা তার হাতের মধ্যে নিলে,—আমার মুখের পরে তার ব্যথাভরা দুটি চোখের দৃষ্টি রেখে ব্যথাভরা স্বরে বললে, "নিলুম—কিন্তু পত্নীরূপে নয় বীণা ভগ্নিরূপে। একটু আগে যার জন্যে তুমি ফিরে গেলে, যার জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করলে, তোমার সে ব্রহ্মচর্য্য আমার দ্বারা নষ্ট হবে না, তোমার ত্যাগকে আমার ত্যাগ দিয়ে আরও মহীয়ান—আরো গরীয়ান করে তুলব। আমি তোমায় এনেছি বলেই তুমি আজ ধর্ম্মচ্যুতা—সমাজচ্যুতা। সমাজচ্যুতা হতে পার, কিন্তু ধর্ম্মচ্যুতা তো হওনি বীণা, তোমার ধর্ম্মকে আমি অটুট রাখতে সাহায্য করব। বড় ব্যথায় আবার তুমি ফিরে এসেছ, যা ঘৃণা করেছ তাই নিতে চাচ্ছো। তুমি দিতে চাইলেই কি আমি তোমার এ দান নিতে পারব বীণা, আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, যে জ্ঞান পেয়েছি সেই জ্ঞানের মধ্যে তোমার আসন, অজ্ঞানতার মধ্যে নয়। তুমি আমার চির উপাস্যা দেবী, কামনার বস্তু। সে কামনা দৈহিক নয়—অন্তরের। এ জন্মে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, কিন্তু যদি পরজন্ম থাকে—সে জন্মে তুমি আমি যেন এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

হারাণো-স্মৃতি

যে বলে সুজাত আলি মুসলমান, কে বলে সে ঘৃণ্য, সে ম্লেচ্ছ ? তার মধ্যে যে ত্যাগীর সংযম আছে তা আমি যে আর কারও মধ্যে দেখতে পাইনি।

সুদীর্ঘ এগার বছর—এমনি বড় কাছে অথচ অতি দূরে আমরা বাস করেছি বোন। আমার স্বাতন্ত্র্য সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলতো, কিন্তু জীবনে সে বিয়ে করলে না। কত অনুরোধ করেছি, সে শুধু মুখের পানে তাকিয়ে বড় করুণ হাসি হাসত আমি আর তাকে বলতে সাহস করতুম না। একদিন সে শুধু বলেছিল যে দিন আবার জন্মাতে পারব সে দিন বলব বিয়ে করব, তার আগে নয়, তুমি আমায় অনুরোধ করো না।"

তারপর আজ তিন বছর হল সে একদিন নিঃশব্দে ধরার বুক হতে ঝরে পড়েছে। যাওয়ার সময় বলে গেল—"আমি সেখানে প্রতীক্ষা করব, তুমি এসো।'

জানিনে আমিও কবে ঝরে পড়ব। বিশ্বের ত্যক্ত এই জীবন বোঝাটা টেনে আর বেড়াতে পারছিনে বোন, পা দুখানা ভেঙ্গে পড়তে চায়।

বলতুম না কোন কথা, তোর পত্রখানা আমার প্রাণে অনেক কথা জাগিয়ে তুললে—বড় ব্যথায় সব প্রকাশ হয়ে গেল।

কি জানি কবে যাব, কবে আমারও ডাক আসবে ? মাঝির

ডাকের প্রত্যাশায় আছি। সন্ধ্যাতো হয়ে এসেছে, কখন যাব কে জানে।

আসি ভাই, আজকের মত বিদায়। জানিনে আর পত্র দেব কিনা, হয় তো এই-ই শেষ পত্র। আমায় সকলে পতিতা ঘৃণ্যা বলেই জেনেছে, তাদের সেই বিশ্বাসই থাক, আমি তাদের কাছে আর জানাতে রাজি নই—আমি যা তাই আছি। তবে তুই—তোর কথা স্বতন্ত্র, তোর সঙ্গে কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সম্বন্ধ আমার সঙ্গে, তাই তোকে সব জানালুম।

আমার ভালবাসা নিস।

তোর বীণা

ধরার ধারা

স্কুলের বাসখানি মেয়ে বোঝাই অবস্থায় প্রতিদিনই আসা যাওয়া করে।

পথিকের চোখে হাসিভরা কত মুখই না পড়ে, খিল খিল হাসির সুরটা কাণে ভেসে আসে, পথ চলতে তারা অন্ততঃ পক্ষে একটুখানির জন্যেও থমকে দাঁড়ায়, কখনও বা হাঁ করে চেয়ে থাকতে গিয়ে বাস চাপা পড়্‌বার মত হয়। যারা গাড়ীতে থাকে তাদের কাছে এরা যে কতখানি হাস্যকর বস্তু হয়ে উঠে তা যদি জান্‌তো তা হলে আগে হতেই সাবধান হতো।

বড় পথটার ধারে যেখানে একটা সরু গলির মুখ, সেইখানে এসে বাস থেমে যেত। একটী মেয়ে প্রতিদিন ঠিক সেই একই সময়ে গলির ভেতর হতে এসে বাসে উঠ্‌ত। সেই অন্ধকার সরু গলি, যার মধ্যে দুজন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না, কেবল একটা ভাপসা গন্ধ যার ভেতর হতে বার হয়ে এসে বড় রাস্তার ফাঁকা আলো বাতাসে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তারই কোন খানে কোন বাড়ীতে সে থাক্‌ত তা কেইবা জানে।

হারাণো-স্মৃতি

বড় রাস্তার উপরে গলির মুখে মস্ত বড় বাড়ীটায় থাকে শান্তনু। সে প্রত্যহই মেয়েটীকে সেই এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে দেখে। আশ্চর্য্য, বাস আস্‌তে কোন কোন দিন দুচার মিনিট দেরীও হতো, মেয়েটার কোন দিন একটী মিনিট দেরি হতো না, সে ছিল যেন ঘড়ির কাঁটা।

একদিন নয়—দুদিন নয়, মাসের পর মাস, এই একটা বছর ধরে শান্তনু রোজ তাকে দেখে আস্‌ছে। বাদ যেত কেবল রবিবার বা ছুটির দিনগুলো।

মেয়েটিকে প্রতিদিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। রবিবারগুলো নেহাতই অপ্রীতিকর মনে হত, আর ছুটির দিনের তো কথাই নেই। শান্তনুর মনে হচ্ছে এ দিন গুলো বাদ গেলেই ভালো হতো।

প্রতিদিন শান্তনু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বড়দিকে ভাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই জানালাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতো, মাথা আঁচড়ানো শেষ হয় না; বার বার চুল গুলোকে উপর দিকে তোলে, আবার নামায়। ওদিক্ হতে দিদি ডাক দেন, "ভাত যে শুকিয়ে উঠল শান্ত, দেরীই যদি করবি তবে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়্‌তে বলাই বা কেন?'

শান্তনুর ব্যস্ততা অসম্ভব রকম বেড়ে ওঠে, সে উত্তর দেয়, "এইযে হল দিদি, আর দেরী নেই।"

মেয়েটী মুখ তুলে একবার জানালার পানে তাকাতেই তার সুগৌর মুখখানা দেখ্‌তে পায়, তারপরই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাসে উঠে পড়ে।

বয়স খুব বেশী নয়, সম্ভব সতের আঠার হবে। দেখ্‌তে খুব যে সুন্দরী তা নয়, লম্বা, দোহারা চেহারা, গায়ের রং ময়লা, মুখখানা মোটের উপর ভালো।

অনেকদিন এ ব্যাপারটা গোপন ছিল, আবিষ্কার করে ফেল্‌লে বন্ধু সুপ্রকাশ।

শুধু আবিষ্কার করাই নয়, ক্লাসের মধ্যে সে বেশ রং ঢং দিয়ে কথাটাকে ছড়িয়ে দিলে, সকলেই হাস্‌লে, শান্তনুর পিঠে মাথায় কেউ কেউ চড় মেরে বললে 'এগিয়ে যাও বন্ধু, আমরা পেছনেই রইলুম। সময় হলে ফুলের ডালা মাথায় নিয়ে শাঁখ বাজিয়ে আমরাই হাজির হব।'

শান্তনুর মুখ লাল হয়ে গেল, সে কেবল বল্‌লে,—'যাঃ, সুপ্রকাশের সব মিছে কথা।'

সুপ্রকাশ জোর করে বলে, 'মিথ্যে বই কি। আমি সত্যি বলছি তুই তাকেই ভালোবাসিস্‌ শান্ত, তুই লুকাতে চাইলেও

তোর মুখ চোখ যে প্রমাণ দিচ্ছে। তোর মনের অতল তলে যে গানের স্বর উঠেছে তা বাইরে সকলের কানে পৌঁচেছে, তুই ঢাকবি কি করে? আচ্ছা—যাক, শাঁখ বাজানোর দিনে সবাই জানবে।'

শান্তনু একটু হেসে বলে, 'শাঁক বাজ্‌লে তো,' সুপ্রকাশের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে,—চমৎকার, কিন্তু অতটা ভালো নয় শান্ত, শেষ পর্য্যন্ত টিকবে না।'

শান্তনু কেবল হাসে।

অস্বীকার কবর্‌ার যো নেই, যে সত্যই সেই অপরিচিতা কালো মেয়েটাকে ভালোবাসে। অনেক সুন্দরী মেয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে, শান্তনু ধরা পড়েছে এইখানে।

২

সুপ্রকাশ মেয়েটাকে ভালো করে দেখে বলে—'মাইরি, কি তোর পছন্দ শান্তনু, তোর চোখের বালাই নিয়ে গলায় দড়ি কলসী বেঁধে ডুবে মরতে ইচ্ছে হয়। কলেজেই যে এত সুন্দর মেয়ে রয়েছে, যারা তোকে বিয়ে করতে পারলে, সত্যি খুসি হয় তুই বেচারা তাদের তীরের ফলা এড়িয়ে এসে পড়লি, নিকষ কালো অন্ধকারে, ভালোবাসলি ওই কালো পেত্নীটাকে?

শান্তনু বলে, 'ডেস্‌ডিমোনাকে তা হলে আগেই ফাঁসিতে লট্‌কানো উচিত ছিল।'

জোর দিয়ে সুপ্রকাশ বলে 'নিশ্চয়ই, আমি যদি সে যুগে জন্মাতুম আর বিচারের ভার আমার হাতে থাকত, ডেসডিমোনার উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চয়ই দিতুম। সুন্দরকে ভালোবাসে সবাই, অসুন্দরকে ভালবাসে কে? চাঁদ উঠ্‌লে সবই সুন্দর দেখায় তাই চাঁদিনী রাতটাকেই সবাই পছন্দ করে, কয়জন লোক অন্ধকার রাত চায় বল দেখি?'

শান্তনু হেসে উঠে বলে, 'ওইটাই ব্যতিক্রম বন্ধু, আমি আবার অন্ধকারকেই বেশী ভালো বাসি, তাই ঘরের আলো নিবিয়ে দেই, আলো ফুট্‌ত কি করে যদি কালো না থাকৃত।

রাত কালো বলেই না চাঁদ অত সুন্দর দেখায়, রাত যদি আলোময় হতো কোথায় থাকত তোমার চাঁদের আলো, তারার মালা তাই বল দেখি ?'

শান্তনু বাইরের পানে তাকিয়ে থাকে। কালো আর সুন্দর অতটা বিচার করে নিক্তি ধরে মাপ করা দুঃসাধ্য। ভালোবাসা বিচার করে না, মাপ করে না, উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র মানে না। এর গতি উদ্দাম জলস্রোতের মত,—এ চলবেই, যে দিক্ দিয়ে যেমন করে হোক, সাম্‌নে বাঁধ পড়লে সে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌বে একটা পথ ঠিক করে।

শান্তনু জানে সে ওই মেয়েটীকে ভালোবাসে, মেয়েটী এ কথা জানে না, কোন দিন জানতেও পারবে না। চল্‌তে চল্‌তে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই চোখ তুলে সে একবার হয় তো তাকায়, সে তাকানই মাত্র। তার কথা, সেই কালো মেয়েটীর কথা মনে কর্‌তে শান্তনুর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, সমস্ত মনটা অভিভূত হয়ে পড়ে।

কলেজের পড়া কর্‌তে কর্‌তে সে টেবলের পরে, দুইহাত লম্বালম্বি ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, সেই হাতের পরে মাথা রেখে উপুড় হয়ে পড়ে সেই মেয়েটীর কথাই ভাবে।

কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁকে। সে একদিন বড় কাজ

পাবে, মানুষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, ওই নাম না জানা কালো মেয়েটী তার ঘরের সাম্রাজ্ঞী হবে, তার হাসি গানে, কথায় ঘরখানা উজ্জ্বল করে তুল্‌বে। কল্পনায় সে মেয়েটীর কত নামই না দেয়,—লীলা, শ্বেতা, অপরাজিতা, শিউলী; হাঁ, এই রকম নামই তার মানায়।

বিধবা বড়দি দরজায় এসে দাঁড়ান, সস্নেহ দৃষ্টি তার 'পরে রাখেন।

'আহা, খানিকটা বিশ্রাম নিস্। সমস্ত দিন পরিশ্রম, কলেজের পড়া, বিকালে খেলা পরিশ্রম তো বড় কম নয়।'

সন্তানহীনা বিধবার একমাত্র অবলম্বন এই ভাইটী, সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা এই ভাইটীর 'পরে গিয়ে পড়েছে। শান্তনু মুখ তুল্‌তেই দেখতে পায়, দিদি দাঁড়িয়ে আছেন।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আজ আর পড়্‌তে হবে না শান্ত, ঘুম আস্‌ছে বুঝ্‌তে পারছি, শুয়ে পড় বিছানায়।'

শান্তনু হেসে বলত, 'না দিদি, ঘুম আস্‌ছে না তো।'

দিদি জোর করে বলতেন, 'আসছে না বললেই কি আমি শুনব রে? আমি তোর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারছি তোর ঘুম এসেছে। যা, আর দেরী করিসনে, শুয়ে পড় গিয়ে।'

শান্তনু সুবোধ বালকের মত শুতে যায়, দিদি মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলায়।

৩

আরও একটা বৎসর কেটে গেছে। মেয়েটীকে আর দেখা যায় না।

শান্তনু রোজই জানালার পাশে দাঁড়ায়, স্কুলের বাস পথ কাঁপিয়ে, পথিকদের সচকিত দৃষ্টি আকৃষ্ট করে চলে যায়, গলির মুখে আর থামে না।

ভীরু মন,—

ইচ্ছা করলে অতি সহজেই সে মেয়েটীর পরিচয় পেতে পারত, সে কোথায় থাকে সে সন্ধান পেত, কিন্তু সঙ্কোচ, লজ্জা, কুণ্ঠা তার সমস্ত অন্তরটাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। কতদিন কত ইচ্ছাই তার হয়েছে, কিন্তু একটাও তায় পূর্ণ হয় নি।

কিছুদিন পরে হঠাৎ সে জিদ ধর্‌লে সে বিলাত যাবে, সেখানেই পড়বে।

দিদি একেবারে আকাশ হতে পড়্‌লেন, বললেন, কেন আমাদের এ দেশে পড়ে ছেলেরা মানুষ হতে পারে না বুঝি,—সেই জন্য তুই বিলাত যেতে চাস্ শান্ত।'

কিন্তু শান্তনুর জেদ, সে বিলেতে যাবেই, দিদি যদি টাকা

নাও দেন, সে পালিয়ে যাবে। এ বাসনা তার মনে বরাবরই ছিল, মাঝে কিছুদিন সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বিলেতে যাওয়ার কথা তার মোটে মনেই ছিল না।

মেয়েটী অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের বিলাস কেটে গেল, অভিভূত অবস্থা ঝেড়ে ফেলে সে দৃঢ় ভাবে জানালে, সে বিলাত যাবেই কিছুতেই এখানে আর পড়্‌বে না!

দিদি আর বাধা দিলেন না, চোখের জল চোখে রেখে তিনি ভাইয়ের বিলাত যাত্রার আয়োজন করে দিলেন। একদিন শুভক্ষণে দিদির হাতের দইয়ের ফোঁটা কপালে দিয়ে, গৃহদেবতার নির্ম্মাল্য বাক্সের মধ্যে নিয়ে শান্তনু হাওড়ায় বম্বে মেলে উঠে পড়্‌ল।

দিদি সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন, মেলে ভাইকে তুলে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বার বার বলে দিলেন, "ওখানে গিয়ে খুব সাবধানে থাকিস শান্ত, কেউ ওখানে তোকে দেখ্‌তে নেই কথাটা মনে রাখিস্। প্রতি মেলে চিঠি দিবি, চিঠি না এলে আমিই হয় তো তোর ওখানে গিয়ে উঠ্‌ব।"

সেটা কিন্তু দিদির পক্ষে অসম্ভব নয়। সেবার বম্বে বেড়াতে গিয়ে শান্তনু দিদিকে পত্র দিতেই ভুলে গেছল, দিদি হঠাৎ এক দিন একা তার কাছে গিয়ে পড়েছিলেন। সিভিলিয়ান স্বামীর

সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়ে তাঁর সাহস হয়েছিল অপরিসীম, আজ অথচ এই শান্ত বিধবার পানে তাকিয়ে কেউ বুঝতেও পারে না তাঁর মধ্যে শক্তি সাহস শিক্ষা কতখানি আছে।

দুনিয়ায় তাঁর অবলম্বন একমাত্র শান্তনু, তাকে ছেড়ে তিনি একটা দিনও থাকতে পারেন না। সে তাই বার বার বলে গেল সে প্রতি মেলে পত্র দেবে, দিদি একা যেন সাগর পারে পাড়ি না দেন।

৪

কালো মেয়েটার স্মৃতি মন হতে মোছে না, কারণ শান্তনুর জীবনে সেই এসেছিল প্রথম হয়ে, তাকেই সে প্রথম ভালোবেসে-ছিল। জীবনে তারপরে অনেকেই আসে যায় কিন্তু প্রথমের স্মৃতি মনের অতল তলে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে যায়, সে আর মোছে না।

শত সহস্র শ্বেতাঙ্গিনীর চটুল হাসি, চপল চাহনি ব্যর্থ হয়ে যায়। শান্তনু সংযত ভাবে চলাফেরা করে, অতি সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। ওদের সমাজে অবাধে মেলামেশা করে তবু কেউ ওকে ছুঁতে পারে না।

হঠাৎ একটী মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল, প্রথম দৃষ্টিতেই একে তার ভালো লাগ্‌ল। জীবনের প্রথম ঊষায় যে মেয়েটীকে সে দেখেছিল, যাকে ভালোবেসেছিল, তারই দুইটী কালো চোখের ছায়া এর চোখে পড়েছিল।

শান্তনু একে আলাদা ভাব্‌তে পারেনি, সেই প্রথমার কথা মনে করেই একে অন্তরে স্থান দিল। প্রথমার সঙ্কোচ দূর হয়ে গিয়েছিল আজ সে তাই অসঙ্কোচেই দিদির কাছে মত চেয়ে

পাঠালে,—সে হেনরিয়েটাকে বিয়ে কর্‌তে চায়, দিদির তাতে মত আছে কি না।

আজ সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল এই সাহসটা সে পেলে কি করে? কয়টা বৎসর আগে যদি এই সাহসটা তার অন্তরে জাগ্‌ত।

নিজেরই অজ্ঞাতে সে কবে তার প্রথম অতিথিকে বরণ করে নিয়েছিল, যখন সে চলে গেল, তখন হারাবার ব্যথায় তার সারা বুক ভরে উঠেছিল।

এখন সে কোথায় কে জানে?

মানস চোখে শান্তনু দেখতে পায় সে মেয়েটী কোন ঘরের বধূ, গৃহিণী, জননী হয়েছে। সে এখন সুখের সংসার পেতে বসেছে, বাইরের কেউ আর তার নাগাল পাবে না।

শান্তনু নামে একটী ছেলে দিনের পর দিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তার পানে চেয়ে থাকত, আজও সেই ছেলেটী সাগর পারে বসে তারই কথা ভাবে, সে কথা সে কোনদিন ভাবে না, ভাব্‌বেও না। যদি কোনদিন কোনক্ষণে শান্তনু তার সামনে পড়ে সে একবার হয় তো চোখ তুলে অপরিচিতার দৃষ্টি তার সারা গায় বুলিয়ে দেবে মাত্র।

হারাণো-স্মৃতি

শান্তনু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

আই, সি, এস হওয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু হেনরিয়েটাকে বিয়ে করে ফেল্‌লে, তারপর একদিন ভারতবর্ষে আসার জন্যে সস্ত্রীক ষ্টীমারে উঠ্‌ল।

৫

অনেক দিন পরের কথা—মাঝে আটটা বৎসর কেটে গেছে। শান্তনু ফরিদপুর জেলায় একটা মহকুমায় বদলি হয়ে এসেছে, সঙ্গে স্ত্রী হেনরিয়েটা ও দুইটী শিশু সন্তান।

দিদি কলিকাতায় থাকেন,—শান্তনু ছুটিতে দিদির কাছে যায়।

সস্ত্রীক শান্তনু যখন দেশে ফিরে এল, তিনি তখন বেশ হাসি-মুখেই তাদের দুজনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিলেন।

এক সময় অতি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি একটী কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দেশে কি তোর উপযুক্ত পাত্রীর অভাব হয়েছিল শান্ত, আমি যে তোর জন্যে একটী মেয়েকে ঠিক করে রেখেছিলুম।"

ছিলনা তা শান্তনু জানে। সে জানে বিদেশিনী হেনরিয়েটাকে হয়তো সে সম্পূর্ণরূপে তার জীবনে মানিয়ে নিতে পারবে না, বিদেশিনী তার মত করে তার দেশকে, তার জাতিকে ভালোবাস্‌তে পারে না,—তবু সে বিয়ে করেছে, সে কেবল দুইটী চোখের মোহে পড়ে।

হারাণো-স্মৃতি

ওই চোখ দুইটীকেই সে প্রথমে দেখেছিল, ওই চোখের দৃষ্টি তাকে জগৎ ভুলিয়ে দিয়েছিল।

দিদির কথার একটী উত্তরও সে দেয় নি।

একদিন একাই হোটেল হতে দিদির বাড়ীতে গিয়ে তিনি স্নান করতে গেছেন শুনে অনেককাল পরে পথের ধারের সেই জানালাটীর কাছে দাঁড়াতে গিয়ে দৃষ্টি পড়ল, ঠিক মাথার উপর-কার একখানা ফটোর দিকে।

সে অকস্মাৎ চমকে উঠল।

এই সেই মুখ, হ্যাঁ, ঠিক সেই-ই তো।

এই মেয়েটিকেই সে এই পথের ধারে কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, এই-ই তার জীবনে প্রথম অতিথি। কিন্তু এর ফটো কে আন্‌লে, দিদি কোথায় পেলেন ?

একদৃষ্টে সে সেই ফটোখানার পানে তাকিয়ে রইল।

একদিন তুমি ওগো স্বপ্নসুন্দরী, তুমি ছিলে অপরিচিতা, তোমার নাম আজও সে জানেনা অথচ তোমার সঙ্গে তার চোখের পরিচয় চিরদিনের, মনে হয় জন্ম জন্মান্তরের। তার আত্মা তোমায় নিবিড় ভাবে চেনে, কবে কে জানে তুমি তার ও অন্তরের মাঝখানে তোমার চিরস্থায়ী আসন পেতে নিয়েছ। ওগো আত্মার আত্মীয়া, তোমারই চোখের ছায়া পড়ে বিদেশিনী

হেনরিয়েটাকে সে জীবন সঙ্গিনী করে নিয়েছে, অথচ জীবন তার সুখময় হয় নি।

আজও স্বপ্নের মত সেদিনগুলার কথা মনে পড়ে।

সে যে নেহাতই স্বপ্ন। ওই পাশের ঘরে কল্পনায় তোমায় বাস্তবে পরিণত করে কতদিন সে কতকিই না বলেছে, কত কিই না করেছে, সেদিনে সে ভবিষ্যতের কত চিত্রই না মনে এঁকেছিল, আজ সে সব হয়ে গেছে একেবারেই মিথ্যা,—একেবারেই নিরর্থক। আজ তুমি—ওগো তুমিও আজ তার কাছে মৃতা—মিথ্যা।

কিন্তু মিথ্যা হলেও আজও তুমি আছ, ছবির চোখ তোমার জীবন্ত মুর্ত্তিটাই মনে করে দেয়।

দিদি স্নানান্তে ঘরে এলেন।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ফটো কার দিদি ?'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে দিদি বললেন, 'এ ফটো তার—যার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা ঠিক করেছিলুম শান্ত। এর নাম সৈকত, এই গলিটার মধ্যেই এদের বাড়ী ছিল। ওর মা একদিন আমার মায়ের সব চেয়ে আপনার বন্ধু ছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে কথা হয়েছিল, তোদের বিয়ে দেওয়া হবে। আমিও একে বড় পছন্দ করেছিলুম, গায়ের রং ময়লা হলেও এর কোমল মুখশ্রী আর স্বপ্নভরা চোখ দুটি আমায় মুগ্ধ করেছিল। তুই

ফিরে এলেই তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব ঠিক করেছিলুম, কিন্তু যখন তোর পত্র পেলুম তুই মেম বিয়ে করছিস তখন বাধ্য হয়ে ওকে জানালুম। তখন আহা, সে যদি কাঁদত—ভালো হত, কিন্তু কিছুই করলে না সে, কেবল খানিক বিহ্বলভাবে আমার পানে চেয়ে রইল ; তারপর একটু হেসে আস্তে আস্তে চলে গেল। সেই যে গেছে, আর সে আসেনি, জানি আর আস্‌বে না।'

খানিক নিস্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, "সে আর সামনে আসে নি, তবু মাঝে মাঝে তার খবর পাই। শুনেছি সে কোথায় কোন স্কুলে কাজ নিয়েছে, সেখানেই আছে। বিয়ে সে করে নি, প্রতিজ্ঞা করেছে কর্‌বেও না।"

অনেকক্ষণ সেই ফটোটার পানে তাকিয়ে থেকে শান্তনু চোখ নামালে।

দিদি তখন বল্‌ছিলেন, "আমি জানি তোকে সে ভালোবাসত। যদিও মুখে কোনদিন একটা কথা বলেনি তবু জানি সেই জন্যেই সে বিয়ে করে নি—বিয়ে করবেও না। এম্‌নি করেই তার জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে।"

শান্তনু বাইরের পানে তাকিয়েছিল, অথচ মুখ ফুটে বল্‌তে পারছিল না এ সব কথা আব না উঠ্‌লেই ভালো হয়, সে আর শুনতে চায় না।

(৬)

স্কুলে প্রাইজ বিতরণ সভার সভাপতি হয়েছিলেন আই, সি, এস, শান্তনু মিত্র।

শান্তনুর মোটরখানা গেটে এসে দাঁড়াতে হেডমিষ্ট্রেস মিস্‌সেন কয়েকটী মেয়েকে নিয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে নিতে এগিয়ে এলো।

শান্তনু মোটর হতে নাম্‌ছিল—

তার পানে তাকিয়ে মিস্ সেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল; তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠল।

শান্তনুও একবার চোখ তুলে তার পানে চেয়েছিল।

সেই—সেই মেয়েটী :—

এ সেই সৈকত ছাড়া আর কেউ নয়। সেই স্বপ্নময় চোখ দুটি আজও তেমনই স্বপ্নভরা রয়েছে। তার সমস্ত দেহের, মনের অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ঘটেনি কেবল চোখ দুটির। এই চোখের কাছে হেনরিয়েটার চোখ! ছি, কি দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল সাদৃশ্য ধরে নিয়েছিল? আজ সে লক্ষ্য করে দেখলে এর চোখে যে স্বপ্ন বিরাজ কর্‌ছে, হেনরিয়েটার চোখে তার এতটুকু ছায়া দেখা যায় মাত্র।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস শান্তনু সামলাতে পারলে না।

মিস্ সেন দুই পা পিছিয়ে গিয়েছিল, তখনই সে ভাব সে সাম্‌লে নিয়ে এগিয়ে এলো, দুইটী হাত তুলে হাসিমুখেই সে নমস্কার কর্‌লে।

শান্তনুও একটা নমস্কার কর্‌লে মাত্র।

সেদিনকার নিয়মিত কাজ যথানিয়মেই শেষ হয়ে গেল। এরই ফাঁকে ফাঁকে শান্তনু সৈকতের পানে চেয়ে দেখ্‌ছিল।

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে তার,—আজ সৈকত তরুণী নয় —তার বয়স বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর। তার দেহে যৌবন এখনও অটুট রয়েছে, কেবল মুখের পরে, তার চোখের পরে কেমন একটা ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

সেই সৈকত—আর সে সেই শান্তনু।

শান্তনুর চোখের সম্মুখ হতে বর্ত্তমান মুছে যায়, জেগে ওঠে বার তের বৎসর আগেকার দিনগুলো।

মনে হয় জানালায় সে দাঁড়িয়ে, তার চোখে ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি; আর নীচে পথে দাঁড়িয়ে বাসের প্রতীক্ষায় একটী তরুণী, এক আধবার সেও চেয়ে দেখে জানালাটার পানে।

তারও অনেক আগে অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ—

সে শিশু, সৈকত নেহাৎ শিশু;—তখন তাদের মায়েরা

প্রতীক্ষা করেছিলেন, এরা বড় হলে এদের বিয়ে দিতে হবে।

শান্তনু আবার বর্ত্তমানে ফিরে আসে—

শান্তনু শান্তনু, আর সৈকত সৈকত দুজনের মাঝে অসীম অনন্ত ব্যবধান। সৈকত তার জীবনের এই পথ নির্ব্বাচন করে নিয়েছে, এ পথে শান্তনুর দেখা মিল্‌বার আশা সে হয় তো কোনদিনই করে নি।

সেদিন শান্তনু যখন ফিরল, তখন সকলেই তার সঙ্গে দেখা কর্‌লে, এলো না কেবল সৈকত। সেক্রেটারী উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বললেন, "হেডমিষ্ট্রেস্ মহাশয়া দারুণ মাথার যন্ত্রণায় শুয়ে পড়েছেন, তিনি আজ আর উঠ্‌তে পারছেন না।"

শান্তনু শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

(৭)

দিদির পত্রের সঙ্গে আর একখানা পত্রও এসেছিল।

শান্তনু আগেই দিদির পত্রখানা পড়্‌লে—

"আজই সৈকতের পত্রখানা পেয়েছিলুম শান্ত, তোমায় পাঠিয়ে দিলুম পড়ে দেখ। সে কাল চলে গেছে, বলে গেছে জীবনে আর কখনও সে ফিরে আস্‌বে না।

সত্যি, তার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়, বড় কষ্ট পাই। সুখের সংসার সেও পাত্‌তে পারত, পারলে না,—সেও ফুটতে পারত, পারলে না—মুকুলেই সে শুকিয়ে উঠেছে।

দুনিয়ায় এমনই কত ব্যাপারই ঘটছে শান্ত, কত আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সাগরের অতল তলে কত মাণিকই রয়ে গেছে, যদি তাদের উঠানো যেত, জগত আলোয় ভরে উঠত, কিন্তু সেগুলোকে উঠানো যায় নি।

আজ আমার কেবল সেই কথাটাই মনে পড়ছে।

শান্ত, আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারছিনে, আজ সেই সব-হারা অভাগিনীর জন্যে আমি সত্যিই চোখের জল ফেলছি, বলছি সে যেন তার বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারে।

হারাণো-স্মৃতি

ওর পত্রখানা পড়ে দেখে আমাকে দিয়েছ, আমি তোমায় পাঠিয়ে দিলুম। আশীর্ব্বাদ নিয়ো।

তোমার দিদি।

শান্তনু এর পরে সৈকতের পত্রখানা খুল্‌লে। সৈকত তার দিদিকে লিখেছে—

দিদি, আজ চিরবিদায় নিচ্ছি, আপনার কাছ হতে, আশীর্ব্বাদ করুন আর যেন আমায় ফিরে না আস্‌তে হয়।

আমি একেবারে রেঙ্গুণে চলে যাচ্ছি, ওখানে একটা কাজের ঠিক করে নিয়েছি। অনেকদিন হতেই ভাব্‌ছিলাম, এদেশ হতে চলে যাব, কেন যে যাইনি আজ কেবল তাই ভাবি।

দেশের ডাক আমার কাণে পৌঁচেছিল, যাওয়ার সম্ভাবনাটাও যেন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি দেখেছিলুম এর সুনীল আকাশ—কেমন চাঁদ ওঠে, তারা হাসে, এবং শস্যপূর্ণ মাঠ, জলপূর্ণ নদ নদী, এর মানুষ।

আমি এর মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলুম, তবু বলছি যদি আগেই যেতুম।

দিদি, আমি সেদিন হঠাৎ আপনার ভাইকে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, তাঁর স্ত্রীকেও; ওদের চমৎকার মানিয়েছে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল, ভগবান ওদের দীর্ঘজীবী করুন।

হারাণো-স্মৃতি

কালো হওয়া যে কতখানি অপরাধ তা শুধু আজই বুঝি নি দিদি, প্রথম বুঝেছি সেই দিন, যে দিন শুন্‌তে পেলুম তাঁর বিয়ে, কালো, সে চিরদিনই কালো। অন্ধকার কেউ চায় না, চায় বিমল জ্যোৎস্নার আলো।

তাই না কালো রইল পেছনে পড়ে।

আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, ভগবান,—জানি না যে জন্মান্তর আছে কিনা, যদি থাকে আমায় সে জন্মে কালো কোরনা, আমায় গৌরাঙ্গিনী করো।

এ জন্মটা গেল, যাক্‌, দুঃখ নেই, এমনই ভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব, আর কয়টা দিনই বা বাকি—। প্রণাম নিন।

সেবিকা সৈকত।

পত্রখানা পড়তে পড়তে শান্তনুর ভ্রূ দুইটী কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তার সমস্ত মুখখানাই বিকৃত হয়ে গেল।

সৌভাগ্য যে সাম্‌নে তখন কেউই ছিল না।

শাঁখাওয়ালা—

(এক)

"চাই শাঁখা—শাঁখা চাই গো—"

লোকটী শাঁখা লইয়া পথ দিয়া চলিতে চলিতে শ্রান্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল।

বৈশাখের দারুণ রৌদ্র, পথ যেন ফাটিয়া যাইতে চায়। শাঁখাওয়ালা বাধ্য হইয়াই গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; যদিও জানে, এই গলির অধিবাসীদের মধ্যে খুব কমই শাঁখার আবশ্যক হয়। ইহারা এত গরীব যে, কোনরূপে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। আরও কয়েকদিন সে শাঁখা লইয়া এদিকে আসিয়াছিল, বৃথাই সারা পথটা চীৎকার করিয়া গেছে, কেহই ডাকে নাই।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বুক পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। পথের কলগুলি জলশূন্য। দুই-একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া সে একঘটি খাওয়ার জলের প্রার্থনা করিয়াছে, কেহ দেয় নাই; উপরন্তু গালাগালিই দিয়াছে।

হারাণো-স্মৃতি

কণ্ঠ দিয়া স্বর বহির্গত হইতেছিল না; তথাপি সে চীৎকার করিতেছিল—'শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

খুট্ করিয়া পার্শ্বের ঘরখানির দরজা খুলিয়া গেল। ঘরখানির দেওয়াল বেড়ার, তাহার গায়ে মাটি লেপা, উপরের চালা টিনের, ভিতরে সম্ভব ছাদ আছে। ঘরের সাম্‌নে সরু ছোট একটী বারাণ্ডা—উপরে টিনের চালা।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছোট একটি মেয়ে, বয়স বোধ হয় চৌদ্দ-পনের হইবে। সুগৌর বর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর, তাহাতে বর্ষীয়সী গৃহিণীর ভাব এখনও ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। আলু-লায়িত চুলগুলা পিছনে ছলিতেছে, মাথায় কাপড় দেওয়া সত্ত্বেও দুই-চারি গুচ্ছ স্কন্ধের উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

মেয়েটীর পরণে একখানি চওড়া লাল পাড় শাড়ী, সিঁথায় উজ্জ্বল সিঁদুর; দু'টী ভ্রূর মাঝখানে উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপটী ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মৃদুকণ্ঠে সে ডাকিল—"তুমি বুঝি শাঁখাওয়ালা, শাঁখা বিক্রী কর্‌ছ?"

হঠাৎ এই মেয়েটীকে এমনভাবে দরজা খুলিয়া প্রশ্ন করিতে শুনিয়া প্রৌঢ় সুবল থতমত খাইয়া গেল;—একটু থামিয়া বলিল —"হাঁ, আমিই শাঁখা বিক্রী কর্‌ছি; তুমি কি পর্‌বে মা লক্ষ্মী?"

মেয়েটী তাহার সুগৌর সুগোল হাতখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া

দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"পরূতে তো ইচ্ছে করে, হাতে কিছু নেই। কতকগুলো কাঁচের চুড়ি ছিল, তাও সেদিন ভেঙ্গে গেছে; ও ঘরের বউ তাই আর একটা লোহা ডান হাতে পরিয়ে দিলে। আচ্ছা, তুমি একটু বারাণ্ডায় বস; আমি ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি—পরূব কি না।"

সুবল বারাণ্ডায় উঠিয়া বসিল; মেয়েটী চলিয়া গেল। মুগ্ধনেত্রে সুবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেক দিনের পুরাতন একটা কথা মনে পড়িতেছিল। তাহার লক্ষ্মী,—মা-মরা মেয়েটা ঠিক্ ইহারই মত দেখিতে ছিল না? ঠিক্ এমনই চেহারা, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, চলিবার ভঙ্গী, এমন কি কথা বলার ভাবটি পর্য্যন্ত! সে আজ দশ বৎসরের কথা—তাহার লক্ষ্মীকে বধূরূপে সাজাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। মেয়েটী দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার শুষ্কগণ্ডের উপর নিজের কোমল গণ্ড রাখিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"বাবা, শ্বশুর-বাড়ীতে আমায় সবাই মারে; তুমি আবার শীগ্‌গির আমায় এনো; নইলে মার খেয়ে আমি মরে যাব।"

হইলও তাই। একদিন সে শুনিল, তাহার লক্ষ্মী নাই!

হারাণো-স্মৃতি

গোপনে শুনিল, মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামী গলা টিপিয়া লক্ষ্মীকে হত্যা করিয়াছে!

সুবল উন্মত্ত হইয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। আজ সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে; চুরি-ডাকাতি কোন কাজেই সে পিছায় না; তবু তাহার মনে হয়,—যদি মেয়েটাও থাকিত, তাহার জীবন-যাত্রা এভাবে চলিত না!

মেয়েটী ফিরিয়া আসিল; মুখ শুষ্ক, বড় বড় চোখ দুইটী যেন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

উৎসুকভাবে সুবল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো মা?"

কান্নাঝরা-স্বরে মেয়েটী বলিল—"না, শাঁখা পর্‌ব না; উনি বল্‌লেন—পয়সা নেই—পরা হবে না।"

সুবল বলিল—"তুমি এস মা, আমি তোমায় শাঁখা পরিয়ে দিয়ে যাই; এর পর যতদিনে তোমার পয়সা হবে, আমায় দিয়ো।"

ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা সে তখন ভুলিয়া গিয়াছিল।

শাঁখার ঝুলি হইতে সে একজোড়া খুব দামী শাঁখার বালা বাহির করিল।

মেয়েটী সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"ওর দাম যে অনেক; অত পয়সা কোনদিন দিতে পার্‌ব না।"

হারাণো-স্মৃতি

সুবল বলিল—"দেখি মা, হাতখানা। বেশী দাম নয়; না হয় বছরখানেক পরেই দিয়ো; আট আনা পয়সা বই তো নয়।"

বালা জোড়া দেখিয়া মেয়েটীর বড় পছন্দ হইয়াছিল; দাম অতি অল্প শুনিয়া সে পরিতে বসিল।

সুবল সন্তর্পণে সেই সুন্দর হাত দু'খানিতে বালা জোড়া পরাইয়া দিয়া অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিল। মেয়েটী হর্ষোৎফুল্ল মুখে বারবার হাত দু'খানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিল—"তুমি মাঝে মাঝে এ দিকে এসো, পয়সা জম্‌লেই আমি দিয়ে দেব।"

ঝুলি স্কন্ধে ফেলিয়া শাঁখাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি মা?"

"আমার নাম লক্ষ্মী—"

সুবল পথে নামিয়া পড়িল।

(দুই)

তাড়িখানা—

দলে দলে লোক আসিয়া জুটিয়াছে। ভিতরের একটা ঘরে জুয়াখেলা চলিতেছে। মাতালেরা তাড়ি খাইতেছে; চীৎকার করিতেছে।

লোকে এ পথ দিয়া যাইতে ভয় পায়; এটা গুণ্ডার আড্ডা। যাহারা এখানে আসে, তাহারা সকলেই পুলিসের হাত-ফেরতা; কেহই নির্দ্দোষ নয়।

পার্শ্ববর্ত্তী আর একখানি ঘরে জিনিস-পত্র ভাগ হয়। এই গুণ্ডাদলের সর্দ্দার সুবল—তাহার নাম এবং প্রতাপ বড় বেশী—সকলেই তাহাকে ভয় করে।

দিনের বেলা সে শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়; সন্ধ্যার সময় হইতে সে আর এক মূর্ত্তি ধরে।

ক্ষুদ্র ঘরটিতে কয়েকজন জুটিয়াছিল। সর্দ্দার সুবল সেদিনকার জিনিসগুলি ভাগ করিয়া দিল। দলের একটী লোকের পকেট কিছু ভারী বলিয়া বোধ হইতেছিল; সুবল

(তিন)

"শাঁখা চাই গো—শাঁখা—"

লক্ষ্মী সাড়া দিল না। শাঁখাওয়ালা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—"কই গো মা লক্ষ্মী, শাঁখার দামটা—"

লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল; হাতখানা তাহার কাপড়ে ঢাকা। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"তুমি যে বলেছিলে একবছর পরে দাম নিয়ে যাবে; এখনই এলে যে?"

সুবল একটু হাসিয়া বলিল—"দেখ্‌তে এলুম মা লক্ষ্মী, আমি যে তোমার ছেলে; ছেলে মাকে দেখতে এসেছে, সেটা তো দোষের নয়। দেখি মা শাঁখাজোড়া।"

লক্ষ্মীর মুখ শুকাইয়া গেল; সে সজল-নেত্রে একবার সুবলের পানে চাহিয়া অন্যদিকে চোখ ফিরাইল।

মনে মনে হাসিয়া সুবল বলিল—"আর একজোড়া বালা এনেছি; ঠিক্ ও জোড়াটার মতন কি না মিলিয়ে নেব। দেখি মা হাতখানা—"

লক্ষ্মী লোহা পরা হাত বাহির করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কাল

রাতে উঠানে বড্ড পড়ে গেছলুম শাঁখাওয়ালা, দুটো বালাই ভেঙ্গে গেছে।”

স্বামী যে লইয়া গিয়াছে, এই ছোট মেয়েটী সে কথা মুখেও আনিল না। প্রশংসমান দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া সুবল বলিল—“যাক্ গিয়ে, এই জোড়াটা পর দেখি মা। একটু সাবধানে চলা-ফেরা কোরো, যেন আবার পড়ে যেয়ো না।”

সে শাঁখা বাহির করিল। বিবর্ণমুখে লক্ষ্মী বলিল—“আবার দিচ্ছ? আমি যে সেই বালার দামই এখনও দিতে পারলুম না।”

“সে হবেথ'ন, তার জন্যে ভাবতে হবে না। দেখি তোমার হাতখানা—”

হাত দু'খানা নিজের কঠিন হাতের মধ্যে লইয়া সুবল বালা পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে এই নিষ্ঠুর লোকটীর দুই চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

“তোমার আর কে আছে মা—বাপের বাড়ীতে কে আছে?”

বিবর্ণমুখে লক্ষ্মী বলিল—“কেউ নেই।”

সুবল প্রশ্ন করিল,—“এখানেও স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই তা বুঝ্‌তে পেরেছি। স্বামী বেশ ভাল তো?”

বালিকা মাথা কাত করিয়া বলিল—“হ্যাঁ, তিনি খুব ভাল।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কাপড়ের পানে তাকাইয়া সুবল বলিল

—"একজোড়া কাপড় এনেছি মা, ছেলে হয়েছি কি না মাকে সাজাতে এসেছি।"

মেয়েটী পিছনে সরিয়া গিয়া সত্রাসে বলিল—"না, কাপড় তুমি নিয়ে যাও শাঁখাওলা, ও আমি নেব না—"

ব্যথিত-কণ্ঠে সুবল বলিল—"লজ্জা পাচ্ছ কেন মা, তুমি যে আমার হারাণো মেয়ে লক্ষ্মী! দশবছর আগে সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল—আর ঘোরে নি! এই দশ বছর আমি তার মত একটি মেয়েকে খুঁজে বেড়িয়েছি; আজ তোমায় পেয়েছি। আজ নেব না বল্‌লেই কি আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবি মা! বুড়ো বাপ তোর এমনই কি ফিরে চলে যাবে?"

সবল বলিষ্ঠ দেহখানা আবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল; সুবলের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিল।

রুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মী বলিল, "কেঁদ না বাবা, আমি কাপড় নিলুম।"

(চার)

পূজা আসিয়াছে।

কয়েকদিন মাধব দলে যোগ দেয় নাই ; সুবলও কয়েকদিন ও পাড়ায় লক্ষ্মীকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। ষষ্ঠীর দিন সুবল কতকগুলি জিনিষ কিনিয়া আনিল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল, লক্ষ্মী লালপাড় শাড়ী পরিতে বড় ভালবাসে। সেইজন্য সে বাছিয়া নিজের পছন্দ মত দেশী লালপাড় শাড়ী একজোড়া কিনিল ; ফরমাইস দিয়া শাঁখার চুড়ি একসেট আনাইল ; আলতা, কাশীর সিঁন্দুরের কৌটা ভরিয়া সিঁন্দূর, কোন জিনিষ লইতেই সে ভুলিল না।

আজ তাহার ঝুলি পূজার উপহারে পূর্ণ হইয়া গেল ; সে ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত পথ নিঃশব্দে গিয়া গলির মধ্যে হাঁকিতে লাগিল—"শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

সে ঘরের দরজা আজ খোলা ; কিন্তু কেহ সে দরজা পথে উঁকি দিল না।

সুবল ধীরে ধীরে পথ হাঁটিতে লাগিল ; উচ্চকণ্ঠে বার বার চীৎকার করিতে লাগিল—শাঁখা চাই গো—শাঁখা।"

কেহই তো আসে না—সুবল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

আজ যদি মাধব বাড়ীতে থাকে, হয় তো সেইজন্যই লক্ষ্মী বাহির হইতেছে না।

খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল—

"মা লক্ষ্মী—শাঁখা এনেছি যে গো—"

"বাবা—"

ঘরের মধ্যে মেঝেয় পড়িয়া লক্ষ্মী।

এ কি, এ কি সেই লক্ষ্মী? তাহার পরণে সেই উজ্জ্বল লালপাড় শাড়ী কই, ললাটে সেই উজ্জ্বল সিঁন্দূর কই, হাতে শাঁখা দূরে থাক, লোহাও যে নাই।

তাহাকে দেখিয়াই লক্ষ্মী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"কা'কে আর শাঁখা পরাতে এসেছ বাবা, যে একদিন জোর করে আমার শাঁখা খুলে নিয়ে লোহা পরিয়ে দিত—সে যে আজ সে লোহাও নিয়ে চলে গেছে গো!—"

বজ্রাহতের মত সুবল দাঁড়াইয়া রহিল।

শনিবারের ট্রেন

যদিও ছয়টা দিনের জন্য মাত্র আসা তবু ইহার মধ্যেই বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে। এ শনিবারে শুধু হাতে যেন বাড়ী না আসা হয়। কপি, কমলালেবু অবশ্য আনিবেই জানা কথা, বড় দেখিয়া একটা ভেটকি মাছ ও গোটাকতক ডিম যেন আনা হয়, বিশেষ দরকার।

কি যে দরকার তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্থূলদেহ স্থূলবুদ্ধি লোচনচন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মাছের জন্য ফরমাস গৃহিণী কোনদিনই করেন নাই, কারণ, এই ভেটকি মাছটাকে তিনি নাকি দুই চক্ষু দিয়া দেখিতে পারেন না। তিনি ডিমের অত্যন্ত পক্ষপাতি কারণ, জিনিষটাকে রাখিয়া ঢাকিয়া ব্যবহার করা চলে।

আসল কথা চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীর স্ত্রী, পাঁচ ছয়টী সন্তানের মা, কাজেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সংসার করিতে হয়। মাছ জিনিষটার দাম বেশী, আনিলে একদিনের বেশী রাখা চলে না, তাহার চেয়ে পল্লীগ্রামে দুই পয়সার চুনো মাছ

কেনা ভালো—খরচে পোষায়, সব পাতে দুই-একটা দেওয়াও চলে।

এবার গৃহিণীর আদেশ পাইয়া লোচনচন্দ্র দিশাহারা হইয়া পড়িলেন।

বড়দিনের বাজার, কাল রবিবারে বড়দিন, বাজার একেবারে আগুন।

বাজারে কপি কিনিতে গিয়া দর শুনিয়া তিনি কয়েকবার পিছাইয়া পড়িলেন। কিন্তু যেমন করিয়াই হোক, অন্ততঃপক্ষে গোটা দুই কপি, আর আটটা কমলালেবু তো কিনিতেই হইবে!

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক যাচাই করিয়া দুইটা কপি ছয় আনা ও আটটা কমলালেবু পাঁচ আনায় লইয়া তিনি তখনকার মত মেসে ফিরিলেন।

শনিবারের ট্রেন ছাড়ে তিনটা পনের মিনিটে, আফিস করিয়া মেসে ফিরিয়া আসিতে হইবে। জিনিষগুলো লইয়া তারপর বাজার হইতে মাছ কিনিয়া লইলে চলিবে।

মেসে সকলের মধ্যে তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রতি শনিবারে মেস খালি হইয়া যায়, সোমবারে আবার পূর্ণ হয়।

মেসে থাকে ঠাকুর, চাকর এবং শ্যামবাবু। এ ভদ্রলোক দীর্ঘ

ছুটিগুলোও এই মেসে থাকিয়া কাটাইয়া দেন। বাড়ী বলিয়া কিছুই যেন তাঁহার নাই, কোথাও তিনি যান না।

মেসের সকল ভদ্রলোকই বেচারা শ্যামবাবুকে বড় করুণার চোখে দেখেন। শ্যামবাবুর তাহাতে লাভ-ক্ষতি কিছুই নাই, নিজের খেয়ালেই তিনি মসগুল হইয়া থাকেন।

কপি কমলালেবু কয়টা লইয়া দ্রুত হাঁটিয়া আসিতেই লোচনচন্দ্র হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন। এই পৌষের শীতেও তাঁহার ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল।

শ্যামবাবু গামছাখানা স্কন্ধে লইয়া কলতলা খালি হইবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়াছিলেন ; কলে তখন রীতিমত স্নানযাত্রা চলিয়াছে।

লোচনচন্দ্রের পানে তাকাইয়া হাসিমুখে শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর সওদা বুঝি ?"

লোচনচন্দ্র উত্তর দিলেন, "আবদার দেখুন না মশাই, এই বড়দিনের সময় কপি কমলালেবু তো চাই-ই, তা ছাড়া আবার ভেটকি মাছের তাগাদা। এই তো সময়, দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল, এখন স্নান, তারপর খাওয়া—"

শ্যামবাবু বলিলেন, "সব হয়ে যাবে'খন মশাই, ট্রেণের এখনও সময় ঢের, সেই তো তিনটের ট্রেণ, দেড়টা দুটোয় আফিস ছুটি

হবে। যান আর দেরি করবেন না, ওগুলো নামিয়ে তেল মেখে আস্থন।" লোচনচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

খানিকপরেই তিনি তেল মাখিয়া গামছা লইয়া কলতলায় আসিয়া জমিলেন।

তাড়াতাড়ি কোনও মতে স্নান করিয়া আহারের ব্যাপার! নিত্যকার মত ভাতের মাঝখানে খানিকটা ডাল ঢালিয়া লইয়া, যা হয় একটু উপকরণ সংযোগে গলাধঃকরণ করিয়া লোচনচন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন। আফিসের সময় হইয়া গিয়াছে, আর দেরী করা চলে না।

পুরাতন ঠাকুর দুঃখে কহিল, "সব যে পড়ে রইল বাবু—"

লোচনচন্দ্র অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "থাক, আর খেতে গেলে সময় পাব না—লেট বেশী হলে সাহেব তেমনি তাড়া দেবে।"

মনে অবশ্য আশা আছে রাত্রের আহার পরিপাটি গোছেরই হইবে, যে হেতু ভেটকি মাছের অর্ডারে, একটু বিশেষত্ব আজ হইয়াছে।

মাথার চুল যেমন তেমন করিয়া আঁচড়াইয়া পায়ে জুতা আঁটিতে আঁটিতে, জামার বোতাম দিতে দিতে লোচনচন্দ্র সর্ব্ব-শেষে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাওয়ার সময় ঠাকুরকে বিশেষ

করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন কমলালেবুগুলা কেহ না খাইয়া ফেলে। রামবাবুর কয়টা ছোট আকারের কপিও ওই ঘরে পড়িয়া আছে, তিনি বাড়ী লইয়া যাইবেন! রামবাবুর অফিস কাছে, ছুটি হইলে তিনি লোচনবাবুর অনেক আগে আসিয়া নিজের কপি লইয়া চলিয়া যাইবেন। ঠাকুর যেন তাঁহার কপি-গুলা একপাশে সরাইয়া রাখে, রামবাবুর কপির সঙ্গে যেন না মিলিয়া যায়।

ঠাকুর সবিনয়ে জানাইল, সেজন্য বাবুকে একটুও ভাবিতে হইবে না। ঠাকুর আগেই দেখিয়াছে, রামবাবুর কপি কয়টা আকারে খুবই ছোট, লোচনবাবুর কপি তাহাপেক্ষা অনেক বড়। সে রামবাবু আসিলে আগেই এই পার্থক্য দেখাইয়া দিবে।

নিশ্চিন্ত মনে লোচনচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

আড়াইটার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি যখন মেসে ফিরিলেন, তখন অনেকেই আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার রুমমেট শ্যামবাবু খার্টিয়ার উপর চৌদ্দ-পোয়া হইয়া শুইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে সুর ধরিয়াছেন :—

তুই মা তারা দুঃখ হরা
তবে আমার চোখে কেন ধারা?

ঘরের মেঝের পানে তাকাইয়াই লোচনচন্দ্রের চক্ষু স্থির।

আটটা কমলার চিহ্ন পড়িয়া আছে খোসা ও কোয়ার চর্ব্বিত অংশ। বড় বড় দুইটি কপির স্থানে আছ, রামবাবুর ছোট ছোট দুইটি কপি।

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল,—গর্জ্জিয়া উঠিয়া লোচনচন্দ্র ডাকিলেন, "ঠাকুর—"

সে গর্জ্জনে শ্যামবাবুর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি তাকাইয়া দেখিলেন—দরজার উপর দাঁড়াইয়া লোচনচন্দ্র। তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত, মুখে দারুণ বিরক্তি ও ক্রোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঠাকুর পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। লোচনচন্দ্র চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বাহির হইয়া আসিল।

"কি হয়েছে বাবু, অমন করে চেঁচাচ্ছো কেন? পাশের বাড়ীর লোকেরা কি মনে করবে বল তো, ভাববে দিনের বেলায় মেসে ডাকাত পড়েছে।"

লোচনচন্দ্র ক্রোধের আবেগে একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, নিরর্থক দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ঠাকুর হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, "সে আমি কি বলব বাবু, বাবুরা সব কথা শুনলে, তবে তো সব রাখব? কপির কথা হাজার বার রামবাবুকে বললুম, তিনি যে চোরের মত দুটো কপি তবু বদলে নেবেন, তা কে জানে? আর কমলা খাওয়ার

কথা বলছেন বাবু—জিজ্ঞেস করুন ওই শ্যামবাবাবুকে,—উনি তো সবই জানেন।”

শ্যামবাবু একেবারে রুখিয়া উঠিলেন, “শ্যামবাবু জানে কি? যত দোষ নন্দ ঘোষ, কেন ঘরে থাকি বলে। আচ্ছা! বোস বেটা ঠাকুর, তোমায় আমি মজা দেখাব, ম্যানেজারবাবুকে তোমার সব কথা বলে দিয়ে দূর যদি না করাতে পারি, আমার নামই শ্যাম ঘোষাল নয়।”

ঠাকুর একেবারে নরম হইয়া গেল। হাত দু'খানা কচলাইতে কচলাইতে বলিল, “আমি কি তাই বলছি বাবুকে, আপনিই সব লেবু খেয়েছেন? আপনি জানেন, তাই বলছি।”

শ্যামবাবু তেমনি রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন, “আমি জানি কি? আমি এই বিছানায় চুপচাপ শুয়ে, সব এসে, হৈ হৈ করে কমলা নিয়ে ছাড়িয়ে খেতে সুরু করে দিলে। আমার মুখে একটা কে কোয়া ধরেছিল? আমি তাই-ই জানি নি। তুমি দেখেছ ঠাকুর, আমি কমলা খেয়েছি?”

উভয়ের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, ওদিকে বেচারী লোচনচন্দ্রের লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

যেমন করিয়া যাহাই হোক, গেল তাঁহার জিনিসগুলো। বড় বড় দার্জ্জিলিংয়ের কমলা, অনেক বাছিয়া পছন্দ করিয়া কেনা,

কত দরদাম, ঝগড়া বিবাদ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে, এমন করিয়া সেগুলি নষ্ট হইল? ছেলেমেয়েরা এগুলি পাইয়া কি আনন্দই করিত! গৃহিণীর মুখে কি তৃপ্তির হাসিই না ফুটিত।

শেষটায় কাণে আসিল শ্যামবাবুর সান্ত্বনা পূর্ণ বাণী—"যাকগে লোচনবাবু, সামান্য আটটা কমলা লেবু বইতো নয়, ওরা খুব আনন্দ করে, হেসেখুসে খেয়েছে! এও তো আপনার সৌভাগ্য! ওই হাসিটুকুই বা দিতে পারে কে বলুন?"

হাসিতে গিয়া লোচনচন্দ্রের দুই চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

হাসি খুসি? গৃহিণীর মুখ যে অন্ধকার হইয়া উঠিবে, আর এই শ্মশ্রু-গুল্ফ শোভিত মুখের হাসি—হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইলেন—ট্রেণের সময় হইয়া উঠিল যে!

সেই কপি দুইটাই হাতে তুলিয়া লইয়া শ্যামবাবুকে একটা শুষ্ক নমস্কার দিয়া লোচনচন্দ্র বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৈঠকখানার বাজারে ঢুকিয়া পড়িয়া একবার দুইটা কপি ও মাছ কমলালেবু পছন্দ মত কিনিতে গেলেন।

কমলা ও কপি অজস্র আছে বটে, কিনিলেনও বটে, কিন্তু যেমন গিয়াছিল তেমনটী আর পাইলেন না, মন ভারি খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

হারাণো-স্মৃতি

মাছটা পাওয়া গেল বেশ মনের মত। বার আনা দাম পড়িল, সে যেন আশার অতীত। এমন একটি মাছ যে বার আনায় পাওয়া যাইবে এ আশা তিনি করেন নাই।

স্কন্ধে ছাতা, বাম হস্তে কপি কমলা, দক্ষিণ হস্তে মাছ ঝুলাইয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও ট্রেণ ছাড়িতে হিসাব মত দুই মিনিট মাত্র দেরী আছে।

পকেটে টিকিট আছে; চেকার তাঁহাকে বেশ চেনে, টিকিট আর না দেখাইলেও চলিবে।

ষ্টেশনে অনেক পরিচিত লোককে দেখা গেল। ইহারা সকলেই এই ট্রেণের প্যাসেঞ্জার, সকলেই বাড়ী যাইবেন।

লোচনচন্দ্র হন হন করিয়া গেটের দিকে ছুটিলেন।

কি বিপদ গেট আজ বন্ধ কেন?

গেটের কাছে দাঁড়াইয়া জন চার পাঁচ লোক।

লোচনচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাহারা হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক পায় না।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোচনচন্দ্র বলিলেন, "এ কি, আজ শনিবারের ট্রেণ নেই?"

একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মশাই, আজ ট্রেণ দেওয়া হবে না।"

"ট্রেণ দেওয়া হবে না—?"

হাত হইতে ধপ করিয়া মাছ, কপি, কমলা তাঁহার অজ্ঞাতেই কখন পড়িয়া গেল, সে খেয়ালই তাঁহার রহিল না।

শনিবারের ট্রেণ বন্ধ—

এমন অস্বাভাবিক কথাও তো কেহ শুনে নাই। বোধ হয় এ লাইনে যতকাল ট্রেণ চলিয়াছে, তদবধি শনিবারের ট্রেণ আছে, শনিবারের পাসেঞ্জার বরাবরই যায় আসে। আজ হঠাৎ সেই ট্রেণ বন্ধ ইহার কারণ ?

পায়ের কাছে যে সব পড়িয়া আছে, সে দিকে লোচনচন্দ্রের খেয়াল নাই, তিনি দুই পা অগ্রসর হইয়া একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম মশাই, আজ হঠাৎ এ ট্রেণ বন্ধ হওয়ার মানে—?"

তিনিও শনিবারের ট্রেণের যাত্রী। হতাশ ভাবে তিনি দাঁড়াইয়া উদাস নেত্রে কোন এক দিকে তাকাইয়া ছিলেন। তবে তাঁহার মধ্যের সহজ চেতনা লুপ্ত হয় নাই, সেই জন্যই তিনি হাতের কপি আলু পুঁটলী এবং মাছ ত্যাগ করেন নাই।

দারুণ বিরক্তির চিহ্ন তাঁহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ট্রেণ কর্ম্মচারীদের উপর যে ক্রোধ তাঁহার মনে সঞ্চিত হইয়াছিল,

তাহাই তিনি এই নিরীহ ভদ্রলোকের উপর স্থদ সমেত ঝাড়িলেন—

"হওয়ার মানে? জানেন না মশাই—কাল বড়দিন অর্থাৎ খৃষ্টম্যাস ডে. অর্থাৎ এ ছুটি ওদের ও আমাদের বেলা উপভোগই সার বুঝলেন? কি রকম আক্কেল দেখুন দেখি একবার,—হতো আমার এক্তারে—বুঝিয়ে দিতুম। অ্যাঃ, ওদের বড়দিন—তাতে আমাদের কি? না হয় অন্য ট্রেণই বন্ধ কর, তা না, একেবারে এই ট্রেণ খানাই বন্ধ? এই যে মাছ কয়টা কিনলুম মশাই, একি আর থাকবে? সেই রাত নয়টায় গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে যেতে এ যে পচে অখাদ্য হয়ে যাবে।"

তিনি মাছের কথা বলতেই লোচনচন্দ্রের নিজের মাছ ও জিনিষপত্রের কথা মনে পড়িল, তাড়াতাড়ি তিনি ফিরিলেন।

হায়, মাছটাই কেবল পড়িয়া আছে, কমলা ও কপিগুলো কে লইয়া গেল?

কত লোক আসা যাওয়া করিতেছে,—কাহাকে তিনি ধরিবেন, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

লোচনচন্দ্রের ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল—স্কন্ধে হাত দিয়া দেখিলেন—ছাতা আছে যায় নাই।

যাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—সেই হাসিয়া উঠে—

"সে কি মশাই, অমন পাকা ভেটকি মাছটা পড়ে রইল—কেউ নিলে না, কপি আর কমলাই যাবে, এ কখনও হতে পারে?"

কিন্তু হইলও তো তাই—

আজ যে কাহার মুখ দেখিয়া সকালে উঠিয়াছেন তাহার ঠিক নাই।

মাথায় হাত দিয়া লোচনচন্দ্র বসিয়া রহিলেন।

বিধিলিপির উপর মানুষের হাত চলে না,—লোচনচন্দ্রের অদৃষ্ট—তাই আজ ট্রেণ ফেল হইল, দু-দুবার কপি কমলা গেল, ভেটকিটা পড়িয়া আছে বটে—তাহার দশাও তেমনি, মানুষের পায়ের চাপে দলিত, পিষ্ট! এই মাছ লইয়া যাইতে যাইতে পচিয়া ধ্বসিয়া যাইবে, গৃহিণী কি বলিবে?

মাতঙ্গিণীর মুখখানা মনে করিতে লোচনচন্দ্রের বুকখানা শুকাইয়া উঠিল।

প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা—ছয়টা চুয়ান্নতে ট্রেণ ছাড়িবে,—দেশে পৌছাইতে পৌণে নয়টার কাছাকাছি।

শীতটাও দারুণ পড়িয়াছে। বেচারী শনিবারের যাত্রীদের সঙ্গে শত্রুতা করিবার জন্যই শীত কয়দিন কম থাকিয়া, আজ সুদে-আসলে চাপিয়া আসিয়াছে।

অনেক প্যাসেঞ্জার ফিরিয়া গেল,—তাহারা আবার সন্ধ্যার

সময় আসিবে। কয়েকজন গোবরডাঙ্গার যাত্রী বরিশাল এক্সপ্রেসে উঠিয়া পড়িল,—বনগ্রাম হইতে তাহারা আবার কলিকাতা-গামী ট্রেণে উঠিয়া গোবরডাঙ্গায় নামিয়া পড়িবে।

মুস্কিল এই কাছাকাছি প্যাসেঞ্জারদের।

ইচ্ছা হইলেও লোচনচন্দ্র মেসে ফিরিতে পারিলেন না। ঠাকুরের দুষ্টামী তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা দিয়াছে, তিনি এ মেসে আর থাকিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই ছুটির মধ্যেই অন্য মেস ঠিক করিয়া লইবেন এবং তাহার পর একদিন পূর্ব্ব মেস হইতে নিজের জিনিষপত্র আনিবেন ঠিক করিয়াছেন।

অস্থিরভাবে তিনি ষ্টেশনেই পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

বেলা যেন আর যাইতে চাহে না।

বাড়ীতে কেহই জানে না শনিবারের এ ট্রেণ নাই। সেখানে হুলুস্থুল পড়িয়া যাইবে, ছেলেপুলেরা আগেই কাঁদিতে সুরু করিবে, এবং সন্ধ্যা নাগাৎ গৃহিণীর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিবে।

দুঃখও হয়—তাহাতে আবার আনন্দও পাওয়া যায়।

কিন্তু মাছ পচিয়া যাইবে!

কাতর চোখে তিনি মাছটার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

আজ ওবেলায় ভালো আহার হয় নাই, উদর জ্বলিতেছিল। ভাজা চিনের বাদাম হাঁকিয়া যাইতেছিল, তাহাই দুই পয়সার

কিনিয়া পকেটে রাখিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা চিবাইতে চিবাইতে লোচনচন্দ্র বেড়াইতে লাগিলেন।

বেলা কাটিল—

যাক—এবার সন্ধ্যা হইল।

অস্থির ভাবে ঘড়ির পানে তাকাইলেন,—ছয়টা চুয়ান্ন, উঃ, সে তো কম রাত্রি নয়।

কিন্তু আশার সময় উপস্থিত হইল।

গেট খুলিবামাত্র দলে দলে লোক ছুটিল—মুখে চোখে উৎসাহ, লুপ্ত-শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে!

"এই বাবু,—খাড়া রহ—"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া লোচনচন্দ্র দেখিলেন—চেকার পথ বন্ধ করিয়াছে।

এই গলিত মাছ লইয়া সে যাইতে দিবে না। হাতে থাকায় অনেকখানি যায়গায় গন্ধ ছুটিয়াছিল, ট্রেণে প্যাসেঞ্জারেরা এ গন্ধ সহ্য করিবে না।

রাগ করিয়া লোচনচন্দ্র বলিলেন, "সে কি সাহেব, মাছটা একটু খারাপ—তাই বলে ফেলে দেব;"

সাহেব জানাইল—প্যাসেঞ্জারদের জন্য সে এই দুর্গন্ধময় পচা মাছটা কাড়িয়া লইতে বাধ্য।

বোমার মতই লোচনচন্দ্র ফাটিয়া পড়িলেন—"তা বই কি সাহেব, এখন এ কথা তো বলবেই, আমি জানি তোমাদের বদমায়েসী,—ট্রেণখানা আজ বন্ধ করে মাছটাকে পচালে, কপি কমলাগুলো বারভূতে খেলে। তোমাদের মতলব আমি আর বুঝিনে—সব বুঝি—সব জানি। এই নাও—খাও মাছ,—

মাছটা তিনি সাহেবের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর অত্যন্ত-রাগ করিয়াই ট্রেণে গিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বাড়ীতে রাত দশটার সময় তিনি যখন পৌছিলেন, তখন গৃহিণীর নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বহুকাল পরে প্রবাসী বড় চাকুরে শ্যালক আসিয়াছেন, তাঁহাকেই সম্বর্দ্ধনার জন্য কপি ও ভেটকির দরকার ছিল।—

উপযুক্ত সমাদর লাভান্তে লোচনচন্দ্র সেদিন গোপনে চোখ মুছিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

স্মৃতি

অনেক কাল পরে তোমায় পত্র লিখতে বসেছি রেণু,—তোমার শাস্তিভঙ্গ করতে এসেছি, আজকের দিনটার জন্য আমায় মাপ করো।

ভেবেছিলুম তোমায় আর মোটেই বিরক্ত ক'রব না, তোমায় কিছুই জ'নাব না, কিন্তু থাকতে পারলুম না। আজ মনে হচ্ছে—তোমায় সব কথা বলে না যেতে পারলে আমার এই জীবনে শান্তি নেই, এর পরে—অর্থাৎ লোকান্তর গমনের পরে সেখানেও শান্তি পাব না।

ছোটবেলায় কবে মায়ের মুখে গল্প শুনেছিলুম—মানুষে মরে একটা জায়গায় যায় সেখানে নাকি তার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ ক'রে আবার এই পৃথিবীতেই' আসে।

যৌবনে একদিন সে সব কথা উড়িয়ে দিয়েছি, মান্‌তে চাইনি ইহলোকের ওধারে পরলোক আছে, ইহজন্মের পরে পরজন্ম আছে।

মনের কোন অতলতলে মায়ের বলা গল্প পড়ে গিয়েছিল তার

খোঁজ মেলেনি। ভেবেছিলুম—সব ভুলে গেছি, তাই না কোন-দিন সেই অতীত দিনটাকে জাগাতে চাইনি।

কিন্তু আজ সে কথা আবার মনে পড়ছে।

আজ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে চাই—আমার মায়ের কথা মিছে নয়। আবহমানকাল ধরে যে কথাটা চলে আস্‌ছে, তার মূলে হয়তো সত্য আছে, একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আজ এই রোগশয্যায়ও শুয়ে—পৃথিবীর বুকে বিরাট একটা ধূমকেতুর মত নিজেকে মনে করছি!

আজ আরও ভাবছি, আমি তো মরবই, কিন্তু একেবারে তো যাব না, আবার এই পৃথিবীর বুকেই তো আসতে হবে।

সে জন্মে কোথায় যাব কি হব এক একবার তাও ভাবি। বল্‌বে কি সব বলছি, কিন্তু সত্যই আমি দিনরাত বিছানায় পড়ে এই সব ভাবছি! রোগে মানুষের দেহটাকেই কেবল শীর্ণ করে না, মনটাকেও অতিরিক্ত জীর্ণ করে দেয়।

আমায় দেখে তুমি একদিন চিন্‌তে পারো নি, মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলে। আজও না পরিচয় দিলে তুমি জানতে পারবে না—গত জুন মাসে—অর্থাৎ এক মাস আগে তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যে হস্‌পিটালে এসেছিলে, তারই একত্রিশ নম্বর

বেডে যে রোগীটি শুয়ে পড়েছিল—যার উত্থান-শক্তি-রহিত অবস্থা যার কাছে যেতে গিয়ে সেখানকার দুর্গন্ধ তোমায় দারুণ পীড়া দিয়েছিল এবং তুমি বারবার তোমার সৌগন্ধযুক্ত রুমালখানা মুখের কাছে ঘুরিয়েছিলে—সে রোগীটি আর কেউ নয়—সে তোমারই প্রকাশদা।

একদিন তুমি নাকি তাকে বড় ভালবেসেছিলে। তার জন্যে নিজে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পর্য্যন্ত রাজি ছিলে।

আজ তাই ভাবি—ভালবাসা জিনিষটা কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে; এর কুহকে মানুষ কখনও আত্মহত্যা করতেও যায়, আবার সেই ভালবাসা নষ্টও তো হয়ে যায়।

না, রাগ করোনা, জীবন্ত প্রমাণ যে আমিই পেয়েছি। মনে আছে রেণু, আমার জন্য তুমি নিজের ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয় স্বজন সকলকেই ছাড়তে চেয়েছিলে; আমি কায়স্থ আর তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে কিন্তু এই জাতিগত পার্থক্য তুমি রাখতে চাওনি!

মনে আছে তুমি বলেছিলে—আমি তোমায় যেখানে নিয়ে যাব তুমি সেইখানেই যাবে!

হয়তো হতোও ঠিক তাই—যদি না সেই সময় মিঃ চ্যাটার্জ্জি এসে পড়তেন।

হারাণো-স্মৃতি

তিনি ধনী সন্তান, শিক্ষিত কৃতবিদ্য, রূপ তাঁর যথেষ্ট না থাক —তবু তাঁর অনেক কিছুই ছিল যাতে তিনি অনেক মেয়েকেই নিজের পানে প্রলুব্ধ করেছিলেন।

সেই প্রলুব্ধার মধ্যে তুমিও ছিলে একজন।

মেয়েরা এমন ভাবে যেতে পারে তা আমি জানতুম না। আজ সত্য কথাই বলছি রেণু, রাগ করোনা, দুঃখ করোনা, আমার পত্রখানা এখানেই ছিঁড়ে ফেলো না, ধৈর্য্য রেখে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে যেয়ো।

সেই প্রথম আমার এই অভিজ্ঞতা লাভ হল প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি যা কিছু মানসিক সুকুমার বৃত্তি মানুষের অন্তরে থাকে, সে সবই মানুষ ঐশ্বর্য্যের উপরে বলি দেয়।

সকলে দেয় কিনা জানি নে, কিন্তু তুমি দিয়েছিলে।

এর পরই একদিন যখন তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়, তুমি বলেছিলে—আমি যে তোমায় বিবাহ ক'রব, সংসার প্রতিপালন করব কি করে,—কি ভাবে দিন চলবে?

তুমি আমায় উপদেশ দিলে—আগে অর্থোপার্জ্জন কর তারপর আমাকে বিয়ে কর। আমি যে আত্মীয় স্বজন সব ফেলে তোমার সঙ্গে চলে যাব—শেষটায় যদি সে রকম দুঃখপূর্ণ

দিন আসে,—যদি অর্থ থাকে সবই কাটাতে পারা যাবে। সেই দিনের জন্যে বিশেষ করে অর্থ সঞ্চয় করা দরকার।

হাঁ, সেইদিনই আমি তোমার স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলুম।

তবু অবুঝ আমি—তবু তোমার হাতদুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলুম—"আমি তোমায় সাথেই রাখব —অর্থোপার্জ্জন করতে যাব, যেমন করেই হোক অর্থোপার্জ্জন করব। কিন্তু একটা কথা দাও রেণু, যতকাল পরেই হোক— উপযুক্ত অর্থ যখন উপার্জ্জন করে আনব, তোমায় পাব তো?

তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিলে। ডুবতে গিয়েও বুঝি ভালোভাসার এতটুকু প্রবৃত্তি ছিল, আমার মুখের পানে চেয়ে অন্ততঃপক্ষে সেই সময়টুকু তুমি নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করেছিলে।

ভাবতে লাগলুম—কোথায় গেলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারব।

ব্রহ্মদেশের কথা সেই সময়ে কে আমায় বলে দিয়েছিল। আমি শুনতে পেলুম—রেঙ্গুনে গিয়ে অনেকেই আশাতীত উন্নতি-লাভ করেছে। দুই একজনকে চোখেও দেখতে পেলুম।

যেদিন রেঙ্গুনে রওনা হই—সেদিন তুমিও ঘাটে এসেছিলে, আমার ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক আশাই দিয়েছিলে।

গিয়ে পড়লুম একটা সৌভাগ্যের মাঝখানে।

সৌভাগ্যেরই একটা যোগাযোগ হ'য়েছিল—ব্রহ্মদেশবাসীর সেই দলের মধ্যে আমিও গিয়ে পড়লুম। তারা আশা দিলে—শীঘ্রই তারা যে সেগুন কাষ্ঠের বনটা আবিষ্কার করেছে, সেইটাতে হাত দিলেই আমি যথেষ্ট অর্থ পাব।

অসীম অর্থের অধিপতি হব—তোমায় বিবাহ করে আমি সুখের সংসার পাতব—আমার কতখানি আশা।

কিন্তু কিছুই হয় হয়নি রেণু—

অর্থ যথেষ্ট পেলুম,—কিন্তু কি হবে আমার তাতে? আমি ওদের কতকগুলো কাজ করে দিয়ে অনেক টাকা পুরস্কার পেয়ে যখন দেশে আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলুম, সংবাদ পেলুম, তোমার বিবাহ হয়ে গেছে, তুমি ডাঃ চ্যাটার্জ্জিকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছ।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মতই বুকে আঘাত পেলুম, আমি—বিশ্বাস করবে রেণু,—দিন পনের একেবারে মুহ্যমান হয়ে রইলুম। মনে হল মিথ্যেই এত অর্থ সংগ্রহ করেছি।

দেশে ফিরবার উদ্যোগ করতে লাগলুম—এর আগে আমার টাকা আমি যেমন পেয়েছিলুম তেমনই নষ্ট করে ফেললুম। ওর মূল্য তখন আমার কাছে এতটুকু নেই।

হারাণো-স্মৃতি

বনে কতকগুলো বন্যজন্তুর উৎপাত সুরু হোল! আমি নির্ভয়ে সেই বনে সাধারণ কুলীর মত দিন কাটাতে লাগলুম। হঠাৎ একদিন একটা সর্পের দংশনে শয্যাশায়ী হ'লুম। সাপটা বিষাক্ত নয় বটে—তাই আজও আমি বিছানায় পড়ে, তিলে তিলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি—আমার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত—আজও সারেনি। অনেকটা নরমের দিকে এলেও আমার বাঁচার আশা কেউ করে নি। আমি মরব তা আমিও জানি। মরণকে তো আমার আর ভয় নেই!

মরতে ভয় পায় তারা যারা জীবনে সুখশান্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করে, যাদের সামনে আলো আছে। আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার, আমার পেছনে সব অন্ধকার, জীবন আমার কাছে বিভীষিকা, মৃত্যু আমার কাছে পরম শান্তিপ্রদ।

যে দিন তুমি তোমার স্বামী ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে হসপিটাল দেখতে এসেছিলে—

সেদিন তুমি আমার বেডের পাশ দিয়ে চলে গেলে দেখলুম একটীবার মাত্র চোখ বুলিয়ে নিলে। বুঝতে পারলুম, চিনতে পার নি, কিন্তু চিনলেই বা কি করতে রেণু?

কাছে আসতে পারতে কি?

আমি নিশ্চয়ই জানি—আমায় যদি তুমি চিনতে পারতে,

হারাণো-স্মৃতি

তুমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে, তোমার মুখের হাসি মিলিয়ে যেত; তোমার উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিভে যেত, সেখানে জেগে উঠতো ভয়ের ছায়া।—

নিশ্চয়ই ভয়ের ছায়া, কেন না তোমার স্বামীর চোখের সামনে তুমি আদর্শ পতিগতপ্রাণা রূপে থাকতে চাও তাঁকে জানতে দিতে চাও না—অনেকদিন আগে একদিন স্বামী বলে আমায় স্বীকার করেছিলে, আমার জন্যে আত্মীয়-স্বজন সব ছাড়তে প্রস্তুত হয়েছিলে। ভগবানকে সাক্ষ্য রেখে একদিন তোমার হাত আমার হাতে রেখেছিলে—

কিন্তু না, থাক সে সব কথা রেণু—আমি এ সব কথা কোন-দিন কাউকে জানাই নি—আর যে কয়টা দিন বেঁচে থাকব, কাউকেই জানাব না।

তুমি সুখী হয়েছ—

এই আমার শাস্তি, এই আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সুখ। আমি আজও তোমায় ভালবাসি—তোমার এতটুকু কষ্ট দেখলে আজও আমার বুক ফেটে যাবে, তোমার সুখ দেখলে সত্যই আমি সুখী হই।

আমি দিনরাত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি—তোমার মনের শান্তি অটুট থাক—তুমি সুখে থাক।

হারাণো-স্মৃতি

আচ্ছা এটা কি মাস?

মনে হয় আশ্বিন মাস ফিরে এসেছে।

খোঁজ নিয়ে জেনেছি তুমি ক'লকাতায় চলে গেছ, মিঃ চ্যাটার্জ্জি ছুটি নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় আমাদের হস্‌পিটালে নূতন ডাক্তার এসেছেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের ঠিকানা পেয়েছি—তাই আজ এই পত্রখানা দিচ্ছি।

দিন দিন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

সকালবেলা জানালা-পথে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছিল মেঝের 'পরে, সেই রোদটার পানে তাকিয়ে আমি যেন রোগের কষ্ট যন্ত্রণা সব ভুলে গেলুম। আকাশের পানে তাকিয়ে আজ প্রথম দেখতে পেলুম—মেঘগুলো কোথায় সরে গেছে, আকাশের নীল রং আবার ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে সাদা দুই এক টুকরো মেঘ নীলাকাশের বুক বেয়ে ভেসে চলেছে ঠিক বকের মতই।

আজ প্রথম পাখীর ডাক কানে এল।

মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রাণে আজ শরৎ আসার সাড়া জেগে উঠেছে। বাংলায় আজ কি আনন্দ।

হারাণো-স্মৃতি

রোগী রোগের যন্ত্রণা ভুলে গেছে—সকল ঘর আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠছে। এখানে—এতদূরে সে বার্ত্তা জেগে ওঠে বাঙ্গালীর মনে।

সেখানকার আকাশও এমনই নীল, এমনই সাদা মেঘগুলো দল বেঁধে আসছে—আবার ভেসে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে নদী খাল বিল ভরে গেছে, পদ্মফুলে বিলের বুক ভরে উঠেছে,—কতদূর হতে তার লাল রং চোখে পড়ে। নতুন নতুন পাখীরা নীলাকাশের বুকে ভেসে বেড়ায়, কত গান গায়!

সব ফেলে আমি রয়েছি কোথায়—দূর ব্রহ্মদেশে একটা সরকারী হস্‌পিটালে পড়ে!

বেতনভোগিনী নার্শেরা আসছে—নিজেদের কাজ সেরে চলে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র দুইজন—আর সব এ দেশের—অন্য দেশের।

আমি ওদের বলেছি—ওদের জন্যে কিছু অর্থ ব্যাঙ্কে রেখেছি, আমি যদি ভাল হই—নিজেই হাতে করে দেব, আর যদি এর মধ্যে আমার কিছু হয়, সে টাকা তা'রাই পাবে।

ওরা সেইজন্যেই আমার কাছে কাছে থাকে, মানুষের অর্থাকাঙ্ক্ষা এত বেশীও হয়!

আমার মন বুঝেছে এটা আশ্বিন মাস।

হারাণো-স্মৃতি

বাড়ীর পাশে, বাগানটীর কোলে ছোট্ট গ্রাম্যনদীটির বুকেও ছোট ছোট ঢেউ ওঠে।

কত নৌকাই না নানা রংয়ের পাল তুলে যাওয়া আসা করে।

বাগানের কোণে শিউলি গাছটা এই সময়েই না ফুলে ভরে ওঠে? বর্ষায় নদীর জল শিউলি গাছের গোড়া পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়, ফুলগুলো ঝরে জলে পড়ে, স্রোতের টানে কতদূরে চলে যায় ভাসতে ভাসতে—কেই বা জানে!—

বাংলার কত ঘরে প্রতিমা এসেছে—

মহাধূমধামে পূজা হবে।

প্রবাসী তাতে শয্যাগত বাঙালীর মন স্বতঃই চঞ্চল হয়ে উঠে। সকলেই ঘরে ফিরে যাবে, ফিরতে পারব না আমি। আমার দেহ শীগগিরই ইরাবতীর তীরে দাহ হবে—নিজের জন্মভূমির কোলে মৃত্যু লাভ করবার সৌভাগ্য হ'তেও আমি বঞ্চিত!

রেণু, আমার জীবনের এই ইতিহাস।

বাঁচলে আরও কতদিন জের টেনে চলতুম—কিন্তু দিন সংক্ষেপ হয়ে এসেছে—কালের ভেরী আমি শুনতে পেয়েছি, আমায় যেতেই হবে।

আজ এই শেষ বিছানায় শুয়ে মনে হচ্ছে—যদি আমার এমন

একটী বোনও থাকত, সে তার দাদার মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিত, আহার নিদ্রার সময়টুকুও সে পেত না।

কেউ নেই—আমার কেউ নেই!

দুনিয়ায় আমি একা—আমি একাই চলে যাব।

বলবে কেন আমি তোমায় এ সব লিখছি, কেন তোমায় অনর্থক জ্বালাতন করছি?

আগেই তো বলেছি—আমায় ক্ষমা করো। আজকার দিনটা আমার মনে অনেক স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে! যদি বেঁচে থাকতুম—আর কোনদিন আমার কোন কথা—আমার নাম তোমার কানে পৌঁছাত না, কিন্তু আমি, আমি যে যাব—আমার আহ্বান এসেছে!

আজ তোমায় তাই অনেক কথাই বলে গেলুম।

বিদায়, আর কিছু লিখব না। অনেক লিখেছি, এতটা পড়বার ধৈর্য্য তোমার থাকবে কি না তা জানি নে।

তুমি চিরসুখে থাক, আ-মরণ এই প্রার্থনাটুকু আমার বুক জুড়ে রইল। এখন বিদায়—চিরবিদায়। হতভাগ্য প্রকাশদা।

স্পর্শমণি

করালীচরণের দিনগুলি বেশ কাটিয়া যায়।

একা মানুষ, সংসারে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই। কেহ নাই যে বিরক্ত করিবে। সমস্ত রাত্রি নির্ঝঞ্ঝাটে পোহায়। সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া মধু চাকরটা হাতের সাজা তামাক দু'চার ছিলিম টানিয়া নিজের কাজে মনোনিবেশ করে।

বাজারে একখানা মুদিখানার দোকান আছে, সেখানা চলে মন্দ নয়। তাহা ছাড়া পঞ্চাশ বিঘা ধানের জমিও আছে, তাহাতে যে ধান জন্মায়, একটা গোলায় এক বৎসরের মত সঞ্চিত রাখিয়া বাকিটা বিক্রয় করিয়া দিয়াও বেশ লাভ হয়।

ইহার উপর মহাজনীও আছে—তাহাতে আয় হয় বড় কম নয়। স্বদ টাকায় চার পয়সা হিসাবে হইলেও লোকে বাধ্য হইয়া টাকা ধার নেয়,—না লইলে চলে না। গ্রামের মধ্যে এমন অবস্থার লোক খুবই কম যাহারা বলিবামাত্র টাকা দিবে।

গ্রামের নিন্দাপরায়ণ লোকেরা করালীচরণের বৃহৎ উদরের

পানে চাহিয়া বিদ্রূপ করিত। তাহারা বলিত করালীচরণ এত টাকা জমাইয়া কি করিবে, অত টাকা খাইবে কে?

সত্যই করালীচরণের আপনার বলিতে কেহ ছিল না। শুনা যায় তাহার কোন এক খুড়তুতো ভাই কোনকালে ছিল এবং সে রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছিল, সে আছে কি নাই তাহাও কেহ জানে না। করালী নিজেই জানে না সে ভাই আছে কি মরিয়াছে অথবা বর্ম্মা মেয়ে বিবাহ করিয়া সেখানে বর্ম্মিজ হইয়া বাস করিতেছে।

সমস্ত বাংলা দেশ অথবা শুধু বাংলাই বা বলি কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে করালীর আপনার বলিতে আর কেহ নাই।

মধুকে লইয়াই সংসার।

মধুরও দুনিয়ায় আপনার বলিতে কেহ নাই। একটা কথা বাংলায় চলন আছে—জহুরীই জহর চেনে—কথাটা সত্য, এবং সেই জন্যই এই দুইটী লোক পরস্পরকে চেনে এবং পরস্পরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

করালীচরণের সংসারে মধু আছে অনেক কাল, প্রায় কুড়ি বাইশ বৎসর। মেদিনীপুর জেলায় তাঁহার বাড়ী, খাজানা না পাওয়ায় জমিদার তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেয় এবং মধুও একদিন রাত্রে জমিদারকে উত্তম মধ্যম দিয়া পলাইয়া

যায়। যদিও আজ সে জমিদার নাই, তাঁহার পুত্রই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তথাপি মধু আর দেশে যায় নাই, কারণ দেশে তাহার কেহই ছিল না।

মধু এখানে আছে বেশ। করালীর ফরমাস খাটে, তামাক সাজে, সেবা শুশ্রূষা করে এবং রন্ধনের জোগাড়ও করে। করালী যখন দোকান হইতে বাড়ী আসে মধু গিয়া দোকানে বসে, বেচাকেনা করে, আবার করালী গেলে পাইপয়সার হিসাব বুঝাইয়া দেয়।

এক একবার মনে এতটুকু সন্দেহ হইলেও করালী চাপিয়া যায়, কেন না মধোকে হারানো চলে না।

সেদিন দোকান হইতে বাড়ী আসিয়াই, করালী অবাক্ হইয়া গেল। তাহারই ঘরে তাহারই বিছানায় শুইয়া একটী ছেলে—

বয়স বৎসর পনের ষোল হইবে, সুন্দর চেহারা—মুখখানা যেন পাথর কাটিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে।

দরজায় দাঁড়াইয়া করালী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ছেলেটীর পানে তাকাইয়া রহিল, ছেলেটী তাহারই গত কল্য হরিদাসের বাড়ী হইতে আনা "চৈতন্যচরিতামৃত" খানা পড়িতেছিল, করালীকে দেখিয়া সে উঠিল না,—বরং অন্যদিকে পাশ ফিরিয়া নিশ্চিন্তভাবে পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া তাহার উপর পা তুলিয়া দিল।

করালী চশমার মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিল তাহার পরণে করালীরই কাপড় মোটা আটহাতি থান। পাশ বালিশটার উপর পা তুলিয়া দিতে দৃষ্টি পড়িল তাহার পানে—পায়ের তলায় এক রাশ ধূলা কাদা—

করালীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল,—সেখানে একটীও কথা না বলিয়া সে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখিল একপাশে তাহারই আসন পাতা, তাহারই থালায় কে ভাত খাইয়াছে, সম্ভব ওই ছেলেটাই।

"মধো এই বেটা মধো,—বেটা গেল কোথায় রে?"

মধু পাশের ঘরে কি করিতেছিল মনিবের সাড়া পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে করালী বলিল, "বেটা 'লবাব' হয়েছ—না? এই বোশেখ মাসের দারুণ রোদ্দুরে এক ক্রোশ পথ ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী এসে দেখব—বেটা আমার আরাম করে ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেয় শীতলপাটী পেতে ঘুমোচ্ছেন। মনিব বাড়ী আসছে বলে এতটুকু ব্যস্ততা নেই—এতটুকু চঞ্চলতা নেই—"

বলিতে বলিতে ঘরের দরজাপানে তাকাইয়া করালী স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই ছেলেটা আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

সেই দৃষ্টির সামনে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব এবং স্থূলদেহ করালী হঠাৎ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। একটা কথাও আর সে বলিতে পারিল না।

ছেলেটা মিনিটখানেক নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি গম্ভীর মুখে বলিল, "দুপুরবেলা গাঁ গাঁ করে চেঁচানো মোটেই ভাল নয়। একে কয়টা রাত মোটে ঘুম হয় নি, তারপরে যে মনে করছি দুপুরটা একটু ঘুমাব—তারও যো নেই দেখছি।"

তেমনি গম্ভীর ভাবে সে আবার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

করালী একেবারে নিভিয়া গেল, মধুর পানে নিষ্পলকে কতক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তামাক সাজ, এখন আর কথা শুন্‌তে চাইনে। যা কথা থাকে এর পর হবে এখন।"

নিঃশব্দে এক ছিলিম তামাক খাইয়া সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

আজ একটু বেলা করিয়া সে দোকানে গিয়াছিল, ভাত ও একটা তরকারী রন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ভাতের হাঁড়ি খুলিয়াই চক্ষু স্থির, কেবল একজনের মত মাত্র ভাত আছে।

হুঙ্কার করিয়া সে ডাকিতে যাইতেছিল—"ওরে বেটা মধো—"

কিন্তু হুঙ্কার শব্দটা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল,

"ঘরে আবার একজন আছে, এখনই হয়তো আবার আসিয়া দাঁড়াইবে।

মধু পিছনে ছিল, আস্তে আস্তে বলিল, "খোকাবাবু নিজের ভাত নিজেই বেড়ে নিয়েছে বাবু, আমি আজ চিঁড়ে দই খাব ঠিক করেছি, ও ভাত তরকারী আপনার।"

খোকাবাবু যেই হোক অন্য জাতি নহে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইরা করালী কেবলমাত্র একটা শব্দ করিল—"হুম—"

ভাত খাইতে খাইতে সে একবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া লইল ছেলেটী আছে কিনা, তাহার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে মধো, কোথা হতে এলো? একেবারে হাঁড়ি হ'তে ভাত বেড়ে নিয়ে খেয়ে আমার কাপড় পরে আমার বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে,—লোকটা কে, এত খাতিরই বা কিসের?"

মধু উত্তর দিল, "খোকাবাবু নাকি আপনারই ভাইপো, রেঙ্গুনে ছিল, সেখান হ'তে এসেছে।"

রেঙ্গুনে—

চট করিয়া মনে পড়িয়া গেল যাদবের কথা। খুড়তুতো ভাই, মা বাপ কেহই ছিল না, করালীর মা তাহাকে পাঁচমাস বয়স হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। সেই যাদব যখন বড় হইল, মায়ের

স্নেহ সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে লাগিল তখন করালীর সমস্ত হিংসা ঈর্ষা পড়িল গিয়া তাহার উপর।

ফলে এই হইল, আঠার বৎসরের যাদব একদিন রেঙ্গুনে চলিয়া গেল তাহার পর আর কোনও সন্ধান দেয় নাই।

যাদবকে করালী অন্তরে অন্তরে ভালোও বাসিত, তাই যাদবের জন্য সে কষ্টও পাইয়াছিল, যাদবের অনেক খোঁজও করিয়াছিল। এখনও বাল্যের কথা মনে করিতে যাদবের কথা মনে পড়ে, করালী অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

করালী ভাত মাখিতে মাখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ওর নিজের কথা বলেছে কিছু, ওর বাবার কথা—?"

মধু উত্তর দিল, "ওর বাবা মারা গেছে। তিনি নাকি ওকে আপনার কথা বলেছিলেন তাই উনি এখানে এসেছেন।"

"মারা গেছে—হাড় জুড়িয়েছে। জ্ঞাতিশত্রু কিনা—সঙ্গে সঙ্গে ওষুধটাও দিয়ে গেল। আর তুই বেটা ঠিক খাওয়ার সময়ই এ কথাটা বললি, যাতে না তাতে কেবল আমার খাওয়াটা নষ্ট করা বইতো নয়।"

মধু একটী কথাও বলিতে পারিল না, কেবল নিতান্ত আর্ত্ত-ভাবে করালীর ত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের পানে তাকাইয়া রহিল।

হারাণো-স্মৃতি

জ্ঞাতি শত্রু মহাশত্রু। বাঁচিয়া যেমন জ্বালাইয়াছে, মরিয়াও যেমনি জ্বালাইল। নিজে তো এতটুকু বেলায় হইতে মা কাড়িয়া করালীকে সব রকমে জব্দ করিয়াছে, মরিয়াও রাখিয়া গেল একটা ছেলে, এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে এই বর্দ্ধমান জেলার ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিত করালীই যে তাহার একমাত্র আত্মীয় সে কথাটা বলিয়া গেল।

ছেলেটাই বা কি ডানপিটে। একা নাকি ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই সুদূর রেঙ্গুন হইতে এখানে আসিয়াছে, আবার আসিয়াও কেমন জাঁকাইয়া বসিয়াছে।

নবাব পুত্র আর কাহাকে বলে ?

মধু খাটিতে খাটিতে হায়রাণ, ফরমাসের শেষ নাই। আর বৃদ্ধ করালী, তাহারও হইয়াছে পাপের ভোগ।

মধুর মুখ অন্ধকার যেন শ্রাবণের আকাশ, বর্ষণ হয় আর কি। করালী শ্রান্ত ভাবে বসিয়া তামাক টানে,—জিজ্ঞাসা করে, ভবেশটা কোথা গেল রে মধু—কারো ও বাগানে গিয়ে উৎপাত করছে না তো, পচা পুকুরটায় গিয়ে সাঁতার কাটছে না তো ?"

মধু উত্তর দেয় না।

করালী তামাক টানিতে টানিতে বলে,—"নাঃ, ছোঁড়াটা কোথায় ছিল, আমার হাড় জ্বালাতে এলো। কাল কি করেছে

জানিস? যত গাঁয়ের ছোঁড়াদের নিয়ে মজুমদারের কলম-বাগানে ঢুকে নাকি অর্দ্ধেক আম পেড়ে নষ্ট করেছে। তারা আজ আমায় কি বলাটাই না বললে, কি অপমানই না করলে। কত করে হাতে পায়ে ধরে পনেরটা টাকা দিয়ে তবে গোল মিটালুম—নইলে ঠিক ও ছোঁড়াকে পুলিসে দিত।"

মধুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে একটা কথাও বলিল না।

তামাক পুড়িয়া গিয়াছিল, করালী নিজেই ঢালিয়া ফেলিয়া সাজিতে সাজিতে বলিল, যাই বলিস মোধো, আমি আর সহ্যি করব না—কিছুতেই না, হাতে পায়ে ধরলেও না। আজ আসুক সে বাড়ীতে, তাকে যদি আজই যাচ্ছে তাই না শুনিয়ে দেই, আজই বাড়ী হতে বিদেয় না করে দেই, আমার নাম করালীই নয়। আমি কেন তার জন্যে লোকের কথা সহ্যি করি, আর এমনি করে টাকা দেই—তুই-ই বলতো মধো? ধরে নিয়ে যেত পুলিসে, জেলে দিতো, পচে মরতো আমার তাতে কি?

মধু আর সহ্য করিতে পারে না—ফোঁস করিয়া উঠিল, "তুমি যতই গরজাও কর্ত্তা, তোমার ওকে একটী কথা বলতে হবে না। তোমার সর্ব্বস্ব ওই ছেলে হ'তে যাবে তা আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

হাতের হুঁকা ফেলিয়া করালী উঠিয়া দাঁড়াইল, আস্ফালন করিয়া বলিল, "কি, আমি ওকে কিছু বলতে পারব না? তুই দেখে নিস মোধো, আজই যদি ওকে না দূর করে দেই, তুই আমার নামে কুকুর পুষিস, আমি তাতে যদি একটী কথা বলি—"

বলিতে বলিতে সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, ভিজা কাপড়ে ভবেশ প্রবেশ করিল, গা মাথা হইতে জল ঝরিতেছে।

করালী ত্যক্ত হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, হুঁ, জ্বর হল বলে; সামনে এই বর্ষা আসছে, একবার ম্যালেরিয়া ধরলে আর সহজে নিষ্কৃতি নেই। আমি বেশ জানছি সব জ্বালা আমাকেই পোহাতে হবে,—এ অত্যাচারের ফল আছেই।"

ভবেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করালী আলনার উপর হইতে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া বলিল, "এই কাপড়খানা পরে ওখানা ছেড়ে ফেল, মোধো রোদে শুকাতে দিক। আর গামছা দিয়ে মাথা গা ভালো করে মুছে ফেল। যে রকম অত্যাচার করছিস, দেখছি শীগগীরই একটা জ্বর না করে ছাড়বি নে।"

কাপড় ছাড়িয়া ও মাথা মুছিয়া ভবেশ করালীকে কৃতার্থ করিয়া দিল।

মধু গোপনে বলিল, "তুমিই তো ওর আবদারে প্রশ্রয় দিচ্ছো কর্ত্তা, নইলে—"

করালী বাধা দিয়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "তুই চুপ কর মেধো, তোকে আর বলতে হবে না। ও যে রকম তেজী ছেলে, একটা কথা শুনলে এক্ষুণি চলে যাবে। এসেছে যখন সত্যি তাড়িয়ে দেওয়া যায় কি—তুই-ই বল। যাবেই বা কোন্ চুলোয়, খেতেই বা দেবে কে?"

মধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

ভবেশের অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া উঠে, করালী আর সামলাইতে পারে না।

প্রথম দু চার দিন ভবেশ যথাসম্ভব শান্তশিষ্ট ভাবে কাটাইয়াছিল, তাহার পর তাহার নিজ স্বভাব প্রকাশিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই।

করালী আড়ালে আস্ফালন করে—এবার সে নিশ্চয়ই ভবেশকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে এখানে থাকিয়া ওসব চালাকি চলিবে না। নিজে সে আটহাতি ছাড়া নয়হাতি কাপড় পরে না, ভবেশের জন্য দশহাতি কাপড় চাই। সে

কাপড় আবার ফাইন হওয়া চাই, কম দামের মোটা কাপড় বাবুর পছন্দ হয় না। সেদিন করালী এক জোড়া বেশ মোটা কাপড় হাট হইতে কম দামে কিনিয়া আনিয়াছিল, ভবেশ সে কাপড় ছোঁয় নাই, মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। করালীই আবার সে কাপড় ফেরৎ দিয়া ভালো কাপড় আনিয়া দিয়াছে। জুতা নূতন আসিয়াছে, জামা নূতন আসিয়াছে।

করালী আর পারে না, রীতিমত হাঁফাইয়া উঠিয়াছে।

ভবেশের অত্যাচারও বড় কম নয়। কাহারও বাগানে ঢুকিয়া সর্ব্বনাশ করিবে, কাহারও নব নষ্ট করিয়া দিবে।

করালী বলে—"দুরন্ত ঢের ছেলে দেখেছি, এমন দুরন্ত ছেলে ত একটী দেখিনি। যাদব এমন ছেলেও তৈরী করেছে—অ্যাঁ,—একটু শাসন কৃরতে পারে নি?"

ভবেশ অঙ্কোচে আসিয়া পয়সা চায় আজ তাহার চড়িভাতি, কাল তাহার মাঠে খেলার চাঁদা, পাড়ার কাহাকে সাহায্য করা করালী আর পারে না।

ভবেশ তো জানে না করালী কত কষ্টে এই অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। একটী দুটি করিয়া পয়সা জমাইয়া তবে হইয়াছে এত টাকা। ভবেশকে যে দিন নিজে উপার্জ্জন করিতে হইবে সেদিন মজা বুঝিবে।

মধু টিকটিক করে,—"তুমি করছো কি কর্ত্তা, ও যখন যা চাইবে তখনই তাই দিতে হবে এমন কি কথা আছে? ওকে যে তুমিই আরও অধঃপাতে দিচ্ছো আদর দিয়ে।"

করালী হুঙ্কার ছাড়ে,—"আদর দেই—আদর দেই আমি? অমন নেমকহারামী কথা বলিস নে মেধো, কোন জন্মে আমি কাউকে আদর করিনি, আজ জ্ঞাতিশত্রু যোদোর ছেলেটাকে আমি আদর দিচ্ছি এ কথা তুই বলছিস? ও মরুক ছাড়ুক তাতে আমার কি? নেহাৎ মা বাপ মরা ছেলে তাই কিছু বলিনে কষ্ট পাবে—হয় তো কাঁদবে। তাই বলে তুই স্বপ্নেও ভাবিস নে মেধো—আমি ওকে আদর দেই।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া করালী আবার বলে, "যোদো নেহাৎ আসতে বলেছে তাই, নচেৎ ওকি আমার কাছে আসত, না আমিই ওকে নিতুম? তুই জানিসনে মেধো, যোদো আমার কি শত্রুতাই না করেছে। মাকে শেষ দিন পাই নি, সব জিনিষ আগে পেতো সে। মার কাছে সে রোজ শুতো, আমায় দিতো বাবার কাছে শুতে। তারপর একটু বড় হয়ে কি নিয়ে ঝগড়া করে চলে গেল সেই বর্ম্মায়—যেখানে সহজে কেউ যায় না। তারপর এমনি নেমকহারাম—একখানা পত্র পর্য্যন্ত দেয় নি। এখন সোহাগ জানিয়েছে মরবার সময় ছেলেকে আমার এখানে

পাঠিয়ে। আমি কি ওই ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিতে পারতুম না,—পারতুম,—পারলুম না কেবল—”

কেন যে পারে নাই সে কথা করালী আর বলে না, কেবল তামাক টানে।

না বলিলেও মধু তাহা জানে। এই লোকটী বাহিরে যতখানি রুক্ষ অন্তরে ঠিক ততখানি কোমল। লোককে সে টাকা ধার দেয়, বুকে হাঁটু দিয়া সুদ সুদ্ধ টাকা আদায় করে, না পারিলে জেলে দেয় লোকে ইহাই জানে, কিন্তু যাহারা জেলে যায় তাহাদের পরিবারের অন্নবস্ত্রের খরচ যোগাইতে এই বেচারীর যে প্রাণান্ত হয় সে সংবাদ তো কেহ রাখে না।

করালী প্রশংসা চায় না, নামের আশায় সে কোথাও কোনদিন কোন কাজ করে নাই, প্রকাশ্যে সে একটী পয়সা কাহাকেও হাতে তুলিয়া দেয় নাই। গোপনে যাহারা দান পায় তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—কোনদিন করালীর নাম তাহারা লইবে না।

পিপাসার্ত্ত হৃদয় যখন হাহাকার করিয়া ফিরিতেছিল, একটা কোনও অবলম্বন চাহিয়াছিল সেই সময় আসিয়া জুটিল ভবেশ, করালী নির্ব্বিচারে তাহাকে গ্রহণ করিল, তাহার সম্বন্ধে সেদিন সে এতটুকুও ভাবে নাই।

মধু তাহা জানে। বয়স তাহার বড় কম নয়, কবে পঞ্চাশ পার হইয়া গেছে, মনুষ্য চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা তাহার আছে।

একদিন সত্যই মুখোমুখি ঝগড়া বাধিয়া গেল।

দুই বৎসর করালী সহিয়াছে, এবার আর সহিতে পারিল না।

চুপি চুপি সে ভবেশের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিতেছিল। তাহারই ভূতপূর্ব্ব শ্যালকের শ্বশুরালয়ের আত্মীয়, পিতার একমাত্র কন্যা, অসীম সম্পত্তির অধিকারিণী।

কিন্তু ভবেশ একেবারে বাঁকিয়া বসিল।

করালী অনেক আশা করিয়াছে—ছোট একটী বধূ আসিয়া তাহার গৃহে প্রাঙ্গণে পায়ে তোড়ার রুনুঝুনু শব্দ তুলিয়া মুখে ঘোমটা টানিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, ঝগড়া করিবে, কাঁদিবে, হাসিবে। চিরটাকাল টাকা পয়সার ঝন ঝন শব্দ শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, এখন করালী দুদণ্ড অবকাশ চায় শিশুর সহ মিলিয়া খেলা করিতে চায়, অথচ ভবেশ স্পষ্টই জানাইল সে বিবাহ করিবে না।

ভবেশ যে এমন স্পষ্ট কথা বলিবে তাহা করালী মোটে আশা করে নাই। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে সে স্পষ্ট এমন

বিপক্ষতাচরণ করিতে পারে তাহা যেন দেখিয়াও বিশ্বা হয় না।

গম্ভীর ভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে না করবার কারণ কি? বাপু হে, তোমায় তো কোন দায়িত্ব নিতে হবে না, তুমি যার ঘাড়ে ভর দিয়ে খাচ্ছো পরছো, আমার বউমাও এসে তারই ঘাড়ে ভর দিয়ে চলিবেন, তোমার এত ভাবনা কেন?

ভবেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল সে ও মেয়েকে বিবাহ করিবে না, অন্য মেয়েকে বিবাহ করিবে।

বর্ত্তমানকালে ছেলেরা যে কতখানি নাক কান কাটা বেহায়া হইতে পারে তাহারই নিদর্শন পাইয়া করালী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে করালী জিজ্ঞাসা করিল, "যে মেয়েটীকে তুমি বিয়ে করতে চাও, সে মেয়েটী কে শুনি?"

ভবেশ উত্তর দিল, "সীতাপতি চৌধুরীর মেয়ে"

সীতাপতি চৌধুরীর মেয়ে—

করালী একেবারে বোমার মত ফাটিয়া পড়ে আর কি: হাতের হুঁকা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিতে গিয়া পড়িয়া গেল সে দিকে তাহার দৃষ্টি রহিল না? কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বটে, তুমি অবশেষে সব রকমে আমার

মুখ হাসাবার যোগাড় করছো? অবশেষে কুলীনের ঘরে আনতে চাও বংশজের মেয়ে, সেও আবার দেনদার সীতাপতির মেয়ে,—যে মেয়ের বাপ দেনার টাকা না দিতে পেরে অপমানে শেষে গলায় দড়ি দিয়ে মরে লাঞ্ছনার একশেষ করেছে, অবশেষে তাকেই করলে পছন্দ? কেন, গাঁয়ে আর কি মেয়ে ছিল না? ওই হতচ্ছাড়া হাবাতের ঘরের মেয়ে—"

ক্রোধে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, ভবেশ আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

আবার করালী এবং মধু. মধু এবং করালী। রাগারাগি করিয়া ভবেশ কোথায় চলিয়া গেছে কে জানে।

কথায় আছে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, কিন্তু এ কথা বলা সোজা, কাজে পরিণত করাই মুস্কিল। দেখা যায় শূন্য গোয়ালের চেয়ে দুষ্ট গরু থাকাই ভালো।

করালী এমন কিই বা বলিয়াছিল যাহাতে ভবেশ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। রাগের মুখে লোকে কি বলে না—তুই চলে যা—তোকে দরকার নাই,—সেই একটি কথা শুনিয়া মানুষ চলিয়া যায়?

করালী তামাক টানিতে টানিতে বলে, "যাক গিয়ে, দরকার নেই—কি বলিস মোধো? বাপস্, তুইটী বছরে আমার একেবারে হাড় কালি করে ছেড়েছে। ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, এমন ছেলে যদি আর একটী দেখে থাকি।"

মধু চুপ করিয়া থাকে।

করালী ধমক দিয়া বলে, "মর হতভাগা, কথা বলিস নে কেন, একটা কথা বলতেও কি মুখে বাধে নাকি?"

মধু তথাপি উত্তর করে না।

করালী হুঁকা রাখিয়া তাহার পানে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিতে পায় মধুর চোখে জল—

করালী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, "আরে গেল যা,—মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর বলে যে একটা কথা আছে তুই দেখছি সেই মাসীর দলে। সে তোর কে রে বেটা যে তার জন্যে তুই ভাববি, তার জন্যে তুই কাঁদবি? সে থাকতে রোজ যে তার নামে নালিশ করতিস, আজ সে গেছে বলে অমনি চোখে জল এলো, না, শোন মোধো—

করালী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "ওই মেয়ে মানুষটাকে জব্দ করতে পারিস—ওই সীতাপতির স্ত্রীকে? যত নষ্টের গোড়া ওই মেয়ে মানুষটা। ওই তো ভবেশকে স্নেহ মমতা

দেখিয়ে নিজের করে নিয়েছে, তাই সে আমাদের ছেড়ে গেছে। একটু খোঁজ নে দেখি—ভবেশ ওদেরই ওখানে গেছে কি না।"

মধু সেইদিনই খোঁজ আনিল ভবেশ সীতাপতির স্ত্রীর কাছে রহিয়াছে। সীতাপতির স্ত্রীকে সে নাকি মা বলিয়া ডাকে, এবং যথেষ্ট আদরও পায়। মধু তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিয়াছিল কিন্তু ভবেশ বলিয়াছে যদি সে সীতাপতির কন্যাকে বিবাহ করিতে পায় তবেই বাড়ী ফিরিবে।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে করালী বলিল, "থাক, ওখানেই সে থাক, দরকার নেই তাকে। ওকে আসতেই বা বলেছিল কে—যখন এলো তখন সীতাপতির বাড়ীতে গেলেই পারতো? আচ্ছা, থাকতে দে মোধো, একদিন এলো বলে যখন আমারই কাছে সে আসা ছাড়া ওর আর কোন উপায় থাকবে না। দেখ না, কয়দিন ওখানে থাকতে পারে—

কিন্তু হায় রে, দিনের পর দিনও চলিয়া যায়, ভবেশ আসিল না।

সংসার আগেও যেমন দুইজনকে লইয়া ছিল এখনও তেমনিই রহিল কিন্তু মনে হয় ভিতরে মস্ত বড় একটা ফাঁক রহিয়া গেছে। করালী ভুল করিয়া ভাত রাঁধে ঠিক তিনজনেরই—দুই থালায়

ভাত খাড়া হইলে মধু উঁকি দিয়া হাঁড়ি দেখিয়া বলে, "আর এক-জনের ভাত রহিলো যে কর্ত্তা—"

করালী উত্তর দেয়, "কি জানি, কেমন করে হয়ে গেছে। যাক গিয়ে, ও বেলা ওতেই তোর চলবে, আমি চিঁড়ে খেয়ে থাকব।"

কিন্তু অন্তরের অন্তরালে প্রায় প্রতিদিনই আশা জাগে সে আসিবে। হয় তো দুরন্ত ছেলেটী আসে, আড়ালে কোথাও লুকাইয়া আছে, এই আশায় করালী চারিদিকে চায়, আশায় দুরাশা—

সেদিন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল গত রাত্রে ভবেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুলীন এবং বংশজ—

করালী রাগিয়া কাঁদিয়া ফেলে আর কি। যাদব মরিয়াও এমন শত্রুতা করিয়া গেল; তাহার অপেক্ষাও ছেলেটাকে দিয়া গেল, আর সেই ছেলে সব রকমে মুখ হাসাইল।

করালী উঠিল না, কাহাকেও মুখ দেখাইল না। চোখের জল ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল সে জীবনে আর ভবার মুখ দেখিবে না, যদি দেখে, সে পিতার পুত্র নয়।

বেচারা মধু আজও নির্ব্বাক্ রহিল।

করালী আর ভবেশের নাম মুখেও আনে না, তাহার মুখও দেখে না।

ভবেশকে মাঝে মাঝে দেখা যায়, অত্যন্ত শুষ্ক মুখে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিধবা শাশুড়ী একদিন করালীর বাড়ী কন্যা লইয়া আসিয়াছিলেন, করালী দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর হইতে শুনাইয়া দিয়াছিল—মধু যেন ছোটলোকদের এখনই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয়। এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া উহারা এ বাড়ীর মাটি কলঙ্কিত করিয়াছে। মধু যেন এখনই গোবর জল ছড়া দেয়।

যে কেহ ভবেশের কথা বলিতে আসে করালী তাকেই বেশ দু চার কথা শুনাইয়া দেয়।

মধু একদিন ভবেশের পক্ষ টানিয়া কি কথা বলিতে আসিয়া প্রচণ্ড এক ধমক খাইয়া সরিয়া গিয়াছে। সত্যই করালী যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

সেদিন বাজারের পথ দিয়া আসিতে করালী শুনিতে পাইল ভবেশের নাকি অসুখ করিয়াছে। বাড়ী আসিয়া হাত পা ধুইতে ধুইতে মধুকে উদ্দেশ করিয়া করালী বলিল, "বুঝলিরে

মধু, ভবার নাকি অসুখ করেছে। বুঝুক মজা এবার, কে কত সেবা করে। সেবার এখানে অসুখ হয়েছিল, দিন নেই—রাত নেই, সেবা করেছি, দেখি না—এবার কে কি করে। আমি তো দেখবও না, জিজ্ঞাসাও করব না।”

দুদিন বাদে মধু আসিয়া করালীর কাছে কি বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দোকানে বসিয়া করালী তখন হিসাবের খাতা দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে, কি হল, হঠাৎ কাঁদিতে বসলি যে—”

মধু কথা বলে না, কেবল চোখ মুছে।

কি একটা কথা মনে করিয়া করালী ব্যাকুল হইয়া উঠিল—“হাঁরে, ভবার খবর পেয়েছিস কিছু—ওদিকে গিয়েছিলি?”

মধু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, “তুমি একবার চল কর্ত্তা, খোকাবাবু নাকি রোগে পড়ে আবল তাবল বকছে, তোমার নাম করছে। মা ঠাকরুণ তোমার বকুনীর ভয়ে নিজে আসেন নি, বউমাকে পাঠিয়েছেন—।”

“বউ মা—ভবার বউ—?”

দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মধু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “ভয়ে ঘরে আসতে পারছে না, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।”

করালীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল—বলিল, "দোকান-পত্তর সব রইল মোধো, তুই বন্ধ করে আয়, আমি চলছি।"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভবেশের স্ত্রী।

ছোট্ট মেয়ে, বৎসর বারো তেরো মাত্র বয়স। করালী লক্ষ্মীকে আগেও দেখিয়াছে, আজ বধূরূপে প্রথম দেখিল।

না, অশোভন হয় নাই—চমৎকার। নিতান্ত ছোট, পায়ে তোড়া পরিয়া বেড়াইতে পারিবে। কিন্তু ভবেশ—সে বাঁচিবে তো?

করালী অগ্রসর হইল—বালিকা বধূ যে পিছনে পড়িয়া রহিল সে খেয়াল তাহার ছিল না।

বিছানায় পড়িয়া ভবেশকে একেবারে চেনা যায় না এমন চেহারা হইয়াছে।

করালী মুহূর্তকাল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল—মনে জাগিয়া উঠিল পূর্ব্বস্মৃতি।

হতভাগ্য যাদব। যাদবকে করালী একটী দিনের জন্যও সুখী হইতে দেয় নাই। কি উৎপীড়নই না করিয়াছিল, যাহার জন্য সে বেচারা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এ সেই

যাদবের পুত্র। মরিবার সময় যাদব পুত্রকে সেই করালীর কাছেই আসার কথা বলিয়া গেছে, আর কোথাও যাইতে বলে নাই।

ঠিক যাদবের মতই চেহারা, তাহারই মত তেজ, দর্প, অহঙ্কার, এতটুকু ন্যূন নহে। ছায়াচিত্রের মত অতীতের ছবিগুলা করালীর মানস চোখে জাগিয়া উঠিতেছিল।

"জ্যেঠামশাই—"

ভবের করুণ আহ্বানে করালীর সে ভাব দূর হইয়া গেল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া সে বলিল, "এই যে আমি এসেছি, ভবেশ, তোকে আর বউমাকে আমার বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবার, আর তোকে এখানে থাকতে হবে না।"

ভবেশের পাশে বসিয়া তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে করালী বলিল, "বড্ড রোগা হয়ে গেছিস ভবা, দেখে চেনার যো নেই। দু' দিনের জরেই এত রোগা হয়ে গেলি ভবা—"

ভবেশের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িল, করালীর কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাব জ্যেঠামশাই, এখানে আর আমার ভালো লাগছে না।"

করালী বলিল, "আমি তো তোকে নিয়ে যাব বলেই এসেছি

ভব, বউমাকে শুদ্ধ নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীছাড়া সংসারে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করব। বেয়ান ঠাকরুণ, আপনাকেও যেতে হবে, নইলে ও ছেলেমানুষ বউমাকে সামলানো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আগেকার সব কথা ভুলে যান, আমি যা পাপ করেছিলুম, ভব তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এতদিন এ সোজা কথাটা বুঝিনি, এবার ভবই আমায় বুঝিয়েছে আর সে সব কথা মনে করে বেয়ান ঠাকৃরুণ কষ্ট পাবেন না। আমি আর কয়দিন বলুন, এর পর সব আপনার মেয়ে জামাইয়েরই, ওদেরই কথা মনে করে আপনাকে আমার বাড়ী যেতেও হবে, থাকতেও হবে।”

মধু দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়াছিল, সে বাহির হইতে উঁকি দিয়া দেখিতেছিল!

করালী বলিল, উঁকি দিয়ে দেখছিস কিরে মোধো, একটা পালকী নিয়ে আয়, ভবকেও বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। তারপর একখানা গাড়ীতে বেয়ান ঠাকৃরুণকে আর তাঁর যা যা জিনিষ পত্র আছে সব নিয়ে ওবাড়ী নিয়ে যাবি। এখন চট করে আগে একটা পালকি নিয়ে আয় দেখি, মোটে দেরী করিস নে।”

মধু হাসি চাপিয়া চলিয়া গেল।

আঁধারে আলো

(১)

মধুসূদন দাস নবীনের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল—যদি আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে টাকা সব না মিটাইয়া দেওয়া হয়, সে নিশ্চয়ই নালিশ করিবে। এবার আর মুখের কথা নয়, মধুসূদন দাস এবার দেখাইয়া দিবে তাহার ক্ষমতা আছে কি না।

নবীন কিন্তু একটা উত্তরও দিল না, চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, আর ভেজানো দরজার এতটুকু ফাঁক দিয়া উঠানের বেড়ার বাহিরে মধুসূদন দাসের লাফালাফি দেখিতেছিল। কে যেন ´কাহাকে কি বলিতেছে, মধুসূদন যেন নবীনকে কিছুই বলিতেছে না, এমনই নিশ্চিন্ত তাহার ভাবটা।

অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া, অনেকটা লাফালাফি করিয়া হঠাৎ মধুসূদনেম মনে হইয়া গেল হয়ত নবীন বাড়ীতে নাই, মিথ্যাই সে এত চীৎকার করিয়া লাফাইয়া মরিতেছে।

ঘরের পানে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল দরজাটা ভেজানো

মাত্র, ভিতরে কিছু না দেখা গেলেও মানুষটা যে কাছাকাছিই কোথাও আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

মধুসূদন দরজা ঠেলিয়া একেবারে উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, সামনাসামনি কথাগুলি না বলিলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না।

যতক্ষণ দূরে ছিল নবীন নিশ্চিন্ত ছিল এবং তাহার তামাক খাওয়ারও বিরাম ছিল না; একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়ানোতে বাধ্য হইয়াই নবীনকে তামাক টানা বন্ধ করিতে হইল। মধুসূদন তাহাকে সম্মুখে চায়, অথচ তাহার সম্মুখে যাইতে নবীনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মধুসূদন ডাকিতে লাগিল—"নবীনদা, বাড়ী আছ, একবার এদিকে এসো—কথা আছে।"

নবীন নীরব—যেন বাড়ীতেই নাই।

মধুসূদন আর সহ্য করিতে পারিল না।

অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, "টাকা নেওয়ার বেলায় মনে ছিল না যে, টাকা দিতে হবে? আজ তিনটা বছর হ'য়ে গেছে, আসল টাকা দেওয়ার নাম নেই, সুদ দেওয়ার কথা ছিল মাসে মাসে, তাও নেই। বিয়ে করা কেন এসব লোকের, গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত। দেখি—সাত দিনের মধ্যে যদি সুদ সমেত টাকা না মিটিয়ে পাই, তোমার বউকে ধ'রে

রাস্তায় বের করব, তবে আমার নাম মধুস্থদন দাস। এ আর কাউকে পাওনি যে, কাকুতিমিনতি করলেই ছেড়ে দেবে।”

স্ত্রী টানিয়া বাহির করার কথা—ও ঘর হইতে অভয়াও নিশ্চয় এ সব শুনিতেছে; আর তাহার স্বামীকে কত ছোটলোক মনে করিয়া ধিক্কার দিতেছে।

পুরুষত্বে এইবারই আঘাত লাগিল, তাই পুরুষসিংহ গর্জ্জিয়া উঠিয়া হুঁকা ফেলিয়া ভেজানো দরজা সজোরে খুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বাহির হইল—

“বলি কি হয়েছে দাসের পো, এত গজরানি—এত চীৎকার কেন? একশ'টা টাকা ধার নিয়েছি, স্থদ না হয় তার গোটা ত্রিশেক—না হয় গোটা পঞ্চাশেকই হোক্। ফেলে দেব তোমার স্থদ স্থদ্ধ টাকা—একেবারেই মিটিয়ে দেব। এই সামান্য টাকার জন্যে নিত্যি নিত্যি বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া করতে এসো—আমার পরিবারকে রাস্তায় টেনে বার করতে চাও, একটু লজ্জা করে না এসব কথা বলতে?”

মধুস্থদন তাহার প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া সত্যই থতমত খাইয়া গেল, একটু থামিয়া বলিল, “বলছো তো টাকা দেবে—দিচ্ছ কই?”

নবীন তাহাকে নরম হইতে দেখিয়া খুসি হইল, কিন্তু মুখে

তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ছাড়িল না, বলিল, "আমার টাকার জন্যেই যে নিত্যি তাগাদা দেখতে পাই দাসের পো, এই যে গাঁ-সুদ্ধ লোককে টাকা দিয়েছ, কই, আর কারও বেলায় তো এমন তাগাদা দেখতে পাই না।"

মধুসূদন বলিল, "তোমায় তাগাদা দিই, কেননা তুমি সকলের চেয়ে বুড়ো হয়েছ, কবে কি হবে তার ঠিক নেই, শেষে কি আমার টাকাগুলো মাঠে মারা যাবে?"

নবীন যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—

"আমি মরব আব তুমি বুঝি আকন্দের ডাল চাপা দিয়ে বেঁচে থাকবে, মধুসূদন? না হয় বাষট্টি বছর বয়সই হয়েছে, তোমার চেয়ে ঢের জোয়ান আছি—তা' জানো? বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে—সাতদিনের মধ্যে যদি টাকা তোমার সুদ-সুদ্ধ না দিতে পারি—তুমি আমায় জেলে পাঠিয়ো, আমি জেলের কষ্টও সইব—তোমার অপমান সইব না। বেরোও বলছি—এখনই বেরোও।"

মধুসূদন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, "দেখা যাবে,—সাতদিনের মধ্যে যদি টাকা না পাই, তোমায় এক চোট দেখে নেব। মধুসূদন দাসের যে কথা সেই কাজ, মনে রেখো।"

(২)

দোষ যে কাহার, তাহা ঠিক বলা কঠিন। নবীন দাস দ্বিতীয় পক্ষ গত হইলে আর বিবাহ করিবে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—তাহার পর হঠাৎ প্রায় উনষাট বৎসর বয়সে সে যখন তরুণী পত্নী অভয়াকে সঙ্গে লইয়া ন'পাড়া হইতে যাদবপুরে ফিরিল, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল বড় কম নয়।

তামাক টানিতে টানিতে নবীন দাস লোকের কথার উত্তরে বলিল, "কি আর করি বল, দেখলুম বিধবার জাত-মান-কুল সব যায়, বাধ্য হ'য়ে বিয়ে করতেই হল।"

আসল কথাটা জানিত মধুস্দন। তাহার মামার বাড়ী ছিল ন'পাড়ায়, এবং সে বাল্যকাল সেখানেই কাটাইয়াছে। তাহার পর এখানে আসিয়া বাস করিলেও মাঝে মাঝে আজও সেখানে গিয়া থাকে।

অভয়ার মায়েরই দোষ; বেশী টাকা লইয়া সে জামাতার বয়সের পানে তাকায় নাই। মধুস্দনের সঙ্গে একদিন অভয়ার বিবাহের কথা হইয়াছিল; নবীন বুড়ো যদি না যাইত, এবং মধুস্দন যাহা দিবে বলিয়াছিল তাহার চেয়ে আরও পঞ্চাশ টাকা

বেশী না দিত, তাহা হইলে মধুস্থদনের সহিতই অভয়ার বিবাহ হইয়া যাইত।

মধুস্থদন এসব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে অভয়ার মায়ের সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া বিবাহের আয়োজন ঠিক করিতে বাড়ী আসিয়াছিল, সেই ফাঁকে নবীন দাস যে এত কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আজ যদি মধুস্থদন সেই ক্রোধের বশেই নবীনের উপর জোর জুলুম করিয়া তিন বৎসর পূর্ব্বে ধার দেওয়া একশত টাকা স্থদে আসলে সাতদিনের মধ্যে আদায় করিতে চায়, তাহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

নবীনেরই বা কি আক্কেল! আজ বাদে কাল সে চিতায় শুইবে, সংসারের হিসাব-নিকাশ করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে,—এখন কি আর তাহার বিবাহ করিবার সময়? এই যে মেয়েটাকে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কি এতটুকু ভাবিয়াছে?

অভয়ার মায়েরই বা কি বুদ্ধি! কতকগুলা টাকা পাইয়াই সে ভুলিয়া গেল—,মেয়ের ভবিষ্যতে কি হইবে, সে কোথায় দাঁড়াইবে, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে—তাহাও সে একবার ভাবিল না? এই যে নবীন দাস, উহার আছে কি? জমিদারের কাছারীতে

পেয়াদার কাজ করে, তাও এতদিন কাজ যাওয়ার কথা, অনেক করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া নায়েবের হাতে পায়ে ধরিয়া সে আজও কাজে লাগিয়া আছে।

আজ মধুসূদনই তাহাকে ঘরছাড়া করিতে পারে, উহাদের স্বামী-স্ত্রীকে পথে বাহির করিয়া দিতে পারে। মধুসূদনের নিকট হইতেই টাকা ধার করিয়া সে যে মধুসূদনেরই বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করিয়া আনিবে, তাহা তো সে জানে নাই। আজও সেদিনের কথা ভাবিয়া মধুসূদনের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে।

মধুসূদন ক্রোধে ফুলিতে থাকে—এক এক সময় মনে হয়, এই মুহূর্ত্তেই সে নবীন দাস ও তাহার স্ত্রীকে দেনার জন্য টানিয়া বাহির করিয়া দেয়।

লোকে মধুসূদনের বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, মধুসূদনের দিদি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছে, হাসিমুখে মধুসূদন বলিয়াছে, "রোস না, বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, যখন খুসি তখনই বিয়ে ক'রে ফেলব—তাতে আর কি ?"

(৩)

টাকার চেষ্টায় দুই এক জায়গায় নবীন দাস ঘুরিল, কিন্তু অত টাকা সে পাইবে কোথায়, কে অত টাকা দিবে?

বাড়ী ফিরিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে বলিল, "চুলোয় যাক্ সব, দেখি না সত্যি সে কি করতে পারে? সত্যিই কি আর বাড়ী থেকে বের ক'রে দিতে পারবে? আসল কথা, যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না। ওর প্রকৃতিই ওই রকম—ওকে আমি বেশ চিনি! লোকটা মুখে ওই রকম করে, লাফায় ঝাঁপায়, আসলে ওর মনটা কিন্তু ভারি নরম।"

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সত্যিই যদি সাত দিনের মধ্যে টাকা না দিলে আমাদের বের ক'রে দেয়?"

নবীন হাসিমুখে বলিল, "না না,—ও ওই রকম বলে, কাজে কিছুই করতে পারে না। আমায় প্রায়ই শাসিয়ে যায়—এবার টাকা দিতেই হবে, না দিলে সে একটা কাণ্ড ক'রে বসবেই। কিন্তু সে শাসানো ওই পর্য্যন্ত। আমি ওকে বেশ জানি, এতটুকু বেলা থেকে ওকে দেখে আসছি তো।"

অভয়া বলিল, "অত টাকা নিয়েছিলে কেন?"

নবীন বলিল, "তোমার মাকে দিতে গো, নইলে কি তোমায় পেতুম? আগে মধুর সঙ্গেই তো তোমার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল, সেই সময়ই আমি গিয়ে পড়লুম, নইলে—"

অভয়ার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাক্ গে, ও সব কথা থাক্।"

নবীন হাসিয়া বলিল, "থাক্‌বে কেন? ওর রাগই হয়েছে সেই জন্যে—তা' আমি বুঝি। সত্যি মেজবউ, আমি কিন্তু এক একবার ভাবি—যদি আমি তোমায় বিয়ে না করতুম, মধুর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ'ত, তুমিও সুখে থাকতে পারতে। ওর চারপাঁচটা ধানের গোলা, বাগান, পুকুর, জমাজমি,—একটা মস্ত গেরস্ত, আর আমার কিছুই নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা' নিয়ে আসি—তাতে পেট ভ'রে দু'বেলা খাওয়া পর্য্যন্ত চলে না। সত্যিই আজ যদি আমার কিছু হয়, কাল যে তোমার কি হবে, মেজবউ—"

অভয়া স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল—"বলছি ও সব কথা মনে ভেব না, তা নয়, ওই সব কথাই শুধু বলবে।"

মুখ ছাড়াইয়া লইয়া নবীন একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সত্যিকে কেউ কোনদিন চেপে রাখতে পেরেছে,

মেজবউ? আজ বলছি বটে, মধু আমার কিছুই করতে পারবে না, তবু সত্যি যদি সে কিছু করে, আমার তো তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, ব্যাধ্য হ'য়েই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।”

অভয়া চুপ করিয়া রহিল।

মধুদা কি সত্যিই এমন নিষ্ঠুর হইতে পারিবে, তাহাদের ঘরছাড়া করিতে পারিবে?

একদিনের কথা মনে পড়ে।

মধু তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিত। মা মধুর সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবে ঠিক করিয়াছিল। বেচারা মধু তাহাকে কত জিনিসই না দিয়াছিল! কাপড়, জামা, শাঁখার চুড়ি, এমন কি তাহার কানে আজও যে পাথর-বসানো ফুল দু'খানা রহিয়াছে—এ দু'খানাও মধুর দেওয়া।

একদিন মধু বলিয়াছিল—যদি অভয়াকে সে বিবাহ করিতে না পায়—আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। অভয়া অতটা লম্বা কথা বলিতে পারে নাই, তবে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, সে-ও মধুকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। মধু তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু অভয়া?

অভয়া অন্যমনস্ক হইয়া কোন্ দিকে তাকাইয়া থাকে কে

জানে ? বৃদ্ধ নবীন তামাক টানিতে টানিতে অনর্গল কত কথা বলিয়া যায়, মুখের তাহার বিরাম নাই।

মাঝে মাঝে অভয়া বিরক্ত হইয়া উঠে—তখনই মনে হয়, আহা বেচারা, জগতে উহার আর কেহই নাই। অভয়ার জন্যই আজ তাহাকে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হইতেছে। দিন নাই, রাত নাই, নবীনের কর্ম্মে আলস্য নাই। আজ যদি তাহার পৈতৃক ভিটাখানি ঘুচিয়া যায়, সেও কি অভয়ার জন্যেই নয় ?

অভয়ার নারীচিত্ত অকস্মাৎ মমতায় ভরিয়া উঠে, সে মন হইতে সমস্ত কথা মুছিয়া ফেলিয়া স্বামীর প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেয়।

(৪)

বিমর্ষ মুখে সেদিন বাড়ী ফিরিয়া নবীন বলিল, "শুনছো অভয়া, কালই আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে।" অভয়া ভাতের ফেন ঝরাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কালই—মানে ?"

নবীন তামাক সাজিতে বসিয়াছিল, বলিল, "মধু কিছুতেই ছাড়লে না, সে নালিশ করেছে, কাল পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়ার দিন, যদি কাল বাড়ী না ছেড়ে দিই,—পরশু ওরা জোর ক'রে এসে বাড়ী দখল করবে।"

অভয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল,—নবীন পরক্ষণেই হাসিল, বলিল, "যাক্ গে, বাড়ী যদি যায় যাবেই, তাতে আর কি ? না হয় গাছতলাতেই থাকব—ভিক্ষে ক'রে খাব, সেরকম ক'রেও তো কত লোকের দিন কাটে, অভয়া।" ব্যথাভরা কণ্ঠে অভয়া বলিল, "কাটবে না কেন, দিন সবারই কাটে, সবারই কাটবে। আমার কষ্টের জন্যে আমি তো এতটুকু ভাবিনে, ভাবছি তোমার জন্যে।"

নবীন যেন আকাশ হইতে পড়িল, "আমার জন্যে— ? কেন, আমার জন্যে ভাববার মত কি হ'ল ?"

অভয়া খানিক নির্ণিমেষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখে অকস্মাৎ খানিকটা জল আসিয়া পড়িল, সে অন্য-দিকে মুখ ফিরাইল।

আজ তিন বৎসর সে এই লোকটিকে দেখিয়া আসিতেছে, কোন দিন ইহার মুখে হাসি ছাড়া দেখিতে পায় নাই। যত দুঃখ, বেদনা, কষ্টই আসুক না, সে হাসিমুখে সব বরণ করিয়া লইয়াছে, কোন দিন এতটুকু অসন্তোষ দেখায় নাই। আজ যে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে, গাছতলায় দাঁড়াইতে হইবে, তাহাতেও এ মুখের হাসি তো কই মিলাইল না।

সমস্ত অন্তরটা সেই লোকটীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, যে এই চিরশান্ত লোকটিকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে চায়, একে-বারে বাড়ীছাড়া করিতে চায়।

আজ এই প্রথম সে অনুভব করিল—সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীকেই ভালবাসে, এতদিন একথা তাহার মনে হয় নাই।

নবীন দাস তাহাকে নীরব দেখিয়া ভারি খুসীমনে বলিল, "আমার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না, মেজবউ! নবীন দাস অনেক কিছুই সইতে পারে, কোন কষ্টই তার গায়ে লাগে না।"

অভয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার না লাগুক,আমা লাগে।",

নবীন দাস খানিক ভাবিল, তাহার পর বলিল, "এক কাজ

করি না, মেজবউ; তোমায় তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই, আর আমি”—

অভয়া তাহার কথা শেষ করিতে দিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না, কিছুতেই যাব না। মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের,—মা তো আমায় বিক্রী ক’রে দিয়েছে টাকা নিয়ে।”

নবীন দাস একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “অবে থাকো, কিন্তু অনেক কষ্টই সইতে হবে, অভয়া।”

অভয়া উত্তর দিল, “তা হোক্—আমি সইব।”

তাহার মনে হইতেছিল—একবার মধুস্থদনের সহিত দেখা হইলে সে বেশ দুই কথা শুনাইয়া দিবে।

(৫)

সেদিন সকল বেলা—

মধুসূদন একেবারে উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া হাঁক দিল, "নবীনদা বাড়ী আছে ?"

"না, সে বাড়ী নেই, আমি আছি—"বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে যে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে মধুসূদন বহুকাল দেখে নাই, তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে সে দেখিয়াছিল—সে তখন ছিল কুমারী, আজ সে বিবাহিতা।

হাতে দুইগাছি কেবল রুলি, পরণে একখানা লালপেড়ে শাড়ী, তাহাও শত স্থানে তালি দেওয়া। তবু তাহার পানে তাকাইয়া মধুসূদন থতমত খাইয়া গেল, দু'বার ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া সে বলিল, "দরকার তোমার কাছে নয়, দরকার তার কাছে।"

অভয়া বলিল, "আমি তার স্ত্রী মধুদা', কেবল তার সুখেরই অংশভাগিনী নই, দুঃখের অংশও সমান নিচ্ছি। তার যে কথা তা' আমাকেও বলতে পারো, কারণ শোনবার অধিকার আমারও আছে।"

এই সেই অভয়া!

সে একদিন মধুসূদনের সহিত বিবাহ হইবার অপেক্ষায় ছিল, নবীন দাস যদি না যাইত—সে মধুসূদনের গৃহলক্ষ্মী হইত।

আজ সে দিন চলিয়া গিয়াছে, অভয়াও সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে কি? এত শীঘ্র মানুষ পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া যাইতে পারে?

একটু থামিয়া মধুসূদন বলিল, "কথাটা তো তুমি জানোই, কাজেই গোপন করবার কোন দরকারও দেখছিনে। আসল কথা—তোমাদের কালই এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল—যাও নি কেন, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

গর্ব্বিতভাবে অভয়া বলিল, "না, আমরা যাই নি, আমরা যদি আজও না যাই—তুমি পেয়াদা এনে আমাদের টেনে বের ক'রে দেবে তো?"

মধুসূদন শুধু হাসিয়া বলিল, "যদিই করি, তা-ও তো অন্যায় হবে না, অভয়া। এই তো তিন বছর পার হ'য়ে গেছে—তোমায় বিয়ে করার সময় নবীনদা' আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, এক বছরের মধ্যেই আমার টাকা দিয়ে দেবে—সে কথাটা তাকে একবার মনে করিয়ে দিও তো।"

অভয়া বলিল, "তুমিই যখন তাকে অনবরত মনে করিয়ে দিচ্ছো, আমায় আর সে কথা বলতে হবে না।"

মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি যে, তুমি এমন হ'তে পারো। একদিন নাকি আমায় তুমি খুবই স্নেহ করতে, তাই বুঝি আজ আমার সর্ব্বনাশ করতে চাও ?"

মধুসূদন যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "তোমার আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি, অভয়া ?"

দৃপ্তভাবে অভয়া বলিল, "এই যে ভিটেছাড়া করছ।"

অতৃপ্ত নয়নে তাহার পানে তাকাইয়া মধুসূদন বলিল, "এ ভিটে থাকতে তোমায় কোনদিন নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারব না, অভয়া! আমি তোমায় নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেব, আর—"

অভয়ার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, —"কেন ?"

হতবুদ্ধিপ্রায় মধুসূদন খানিক নির্ব্বাকে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সকল জড়তা দূর করিয়া বলিয়া উঠিল, "কারণ আজও আমি তোমায় ভালোবাসি অভয়া!"

অভয়া বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হাসিল, বলিল, "পাগল, তাই আজও একথা ভাবো! তুমি জানো না, আমি আমার ওই স্বামীকেই ভালোবাসি, হাজার কষ্ট সয়েও ওরই ঘর করতে চাই, তুমি

আমায় রাজবাড়ীতে রাখতে চাইলেও আমি সেখানে থাকতে চাইনে।"

তাহার উজ্জ্বল মুখখানার পানে তাকাইয়া মধুসূদন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অভয়া বলিল, "বাড়ী যাও মধুদা', আমার কথা ভেবে অনর্থক মাথা খারাপ ক'রো না। তোমার টাকার জন্যে এ ভিটে নেবে —সে ভালো কথা, আমিও জায়গা ঠিক করেছি যাওয়ার। এ বাড়ী ছেড়ে আমরা কালই চ'লে যাব, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী দখল ক'রো। এখন দয়া ক'রে যাও—আজকের দিনটা আমাদের নিশ্চিন্তে থাকতে দাও।"

মধুসূদন আর দাঁড়াইতে পারিল না, আস্তে আস্তে ফিরিল।

(৬)

কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন মানুষের!

মধুসূদন ভাবিয়া পায় না—এই কি সেই অভয়া? সেই অভয়ার এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিল কি করিয়া?

বৃদ্ধ নবীন দাসের পরিণীতা স্ত্রী সে,—নবীন দাস কোনক্রমে পেটের ভাত জুটাইতে পারে না, স্ত্রীকে এ পর্য্যন্ত কিছুই দিতে পারে নাই। তথাপি শাক-ভাত খাইয়াও সে সুখী, বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিয়াও সে সুখী।

রাত্রে সে আবার বাহির হইল।

অন্ধকারে লুকাইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল নবীনের রুদ্ধ দরজার পাশটীতে।

ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল, নবীনের হুঁকাটানার শব্দও শুনা যাইতেছিল।

নবীন দাস বলিতেছিল,—"যাক্ গে, কাল না হয় চ'লে যাওয়া যাবে, তাতেই বা দুঃখ কি? তুমি মিছে কেঁদে মরছ, মেজবউ, কই ভিটে ছেড়ে যাওয়ার নামে আমার তো কান্না পাচ্ছে না। দুঃখ একটু হয় বটে—হাজার হোক, বাপ-পিতাম'র

ভিটে—এতটুকু বেলা থেকে এখানে রয়েছি, বাষট্টি বছর বয়সে আজ কোথায় এই ভিটেয়—এই উঠোনে শুয়ে মরব, তা' নয় যেতে হবে কোথায় কে জানে।"

স্ত্রী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কেবল আমার জন্যেই তুমি আজ ভিটেছাড়া হচ্ছো—এ কষ্ট আমার যে কিছুতেই যাচ্ছে না।"

নবীন দাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "তোমার জন্যে কে বললে? মধু আগে অবিশ্যি এরকম খিটখিটে ছিল না, আমি ওকে বেশ জানি, তবে আজকাল একটু খিটখিটে হয়েছে —শুনেছি ওর নাকি শরীরটাও খারাপ হচ্ছে।"

স্ত্রী আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, না গো না, সে তোমায় এখন জব্দ করতে চায়, কেননা তুমি তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, তুমি আমায় বিয়ে করেছ। আজ যদি আমি মরি, তোমাদের আবার মিল হবে, কিন্তু আমি যতদিন থাকব, ততদিন সে তোমার শত্রুতা করবেই।"

নবীন দাস অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, "আমি সব বুঝেছি মেজবউ, আগে অবশ্য বুঝি নি। আমি যে কতখানি অন্যায় কাজ করেছি, তা বুঝে সত্যিই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। আজ যদি এ বিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যেত, আমি নিশ্চয়ই দিতুম।"

আবার খানিক সে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "প্রতিশোধ সে নিতে চায় আমারই উপর দিয়ে, আমি তাই বলছি মেজবউ, আমি কাল চ'লে যাই, তুমি একা এখানে থাকলে সে কখনই তোমায় বের ক'রে দিতে পারবে না। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে—কোথায় ঘুরবে—কেবল কষ্টই পাবে।"

অভয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল,—আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না, কোথাও থাকব না। তুমি যেখানে যাবে, যত কষ্টই হোক, আমি সেখানে যাব।"

মধুসূদন যেমন চোরের মত আসিয়াছিল, তেমনই চোরের মত আস্তে আস্তে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল।

(৭)

পরদিন দুপুরের পরে—

একখানা গরুর গাড়ী বাহিরে সরু পথটার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নবীন দাস উঠানে পেয়ারা গাছটার তলায় হুঁকা টানিতেছে, তামাকের সরঞ্জামগুলি তাহার সামনে পুঁটুলি বাঁধা পড়িয়া আছে।

অভয়া ঘরের ভিতর হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সব বারাণ্ডায় বাহির করিয়া দিতেছে, গাড়োয়ান সেগুলি বহিয়া গাড়ীতে লইয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে মধু আসিয়া দাঁড়াইল।

"চলছ নাকি, নবীনদা'—"

নবীন হাসিমুখেই উত্তর দিল, "না গিয়ে আর করছি কি বল, থাকতে তো আর দিলে না।"

অভয়া কি একটা কথা বলিতে আসিতেছিল, মধুসূদনকে দেখিয়াই তাহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া যাইতেছিল।

মধুসূদন ডাকিল, "এদিকে এসো, অভয়া! কথাটা কেবল নবীনদা'র সামনে বললেই তো চলবে না; তুমি যখন ওঁর সুখ-দুঃখের সমানাংশভাগিনী, তখন তোমারও সে কথা শোনা দরকার।"

অভয়া ফিরিল না, কিন্তু দাঁড়াইল।

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া নবীন দাসের হাতে দিয়া মধুসূদন বলিল, "আমি আজই রাত্রে আমার দিদিকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি কিনা, সেই জন্যে সকালেই সহরে গিয়ে এসব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলে এইমাত্র ফিরে আসছি। তোমরা এখনি যাচ্ছ শুনে স্নানাহার পর্য্যন্ত করিনি, তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। এখানা একবার প'ড়ে দেখ, তারপর যা' হয় ক'রো। তুমিও এদিকে এসো, অভয়া শুনে যাও সবগুলো।"

চমৎকৃত হইয়া নবীন বলিল "এ কিসের কাগজ?"

মধুসূদন বলিল, "প'ড়েই দেখ না কেন?"

দড়িবাঁধা জীর্ণ চশমাখানা চোখে আঁটিতে আঁটিতে নবীন দাস বলিল, "কিসের যে এ কাগজ, তা তো বুঝতে পারছিনে মধু, যাই হোক—যেয়ো না, একটু দাঁড়াও।"

ততক্ষণে মধু দরজা পার হইয়াছে, সেখান হইতেই বলিয়া গেল, "আমার থাকার আর দরকার নেই নবীনদা', এখনকার

যা' তোমরাই ঠিক করবে। মোট এই কথা ব'লে যাচ্ছি—আমি এই রাত্রেই চ'লে যাব, তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাস কর।"

অভয়া ফিরিয়া দেখিল—মধুসূদন পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল।

উত্তেজিত নবীন দাস ডাকিল, "দেখে যাও গো, মধুর কীর্ত্তি শোন। সে সব দান ক'রে দিয়ে গেল, আমাদের আর এবাড়ী ছাড়তে হবে না।"

মহানন্দে বৃদ্ধ নবীন দাস বুঝি নাচিয়াই ফেলে।

অভয়া বিস্ময়ে বলিল, "বুঝতে পারলুম না।"

নবীন দাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কথাটা বুঝতে পারলে না? মধু জানিয়েছে, সে তামাসা করেছিল, দেখতে চেয়েছিল ভিটে ছাড়বার নামে আমরা কি করি। সে আজই সহরে গিয়ে এই রেজেষ্ট্রী ক'রে এনেছে—এই বাড়ী, এর চারদিককার খানিকটা জমিজমা, সব সে আমাদের দান ক'রে দিলে, তা' ছাড়া বন্দোবস্ত করেছে, তার আয় থেকে তুমি মাসে মাসে দশটাকা ক'রে পাবে।"

অভয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল,—

"ভালো কথা, আমাদের দুঃখ তা' হ'লে ঘুচলো—"

সে গাড়োয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে ও সব নাবিয়ে

রেখে যা বাবা, তুই যে এতটা কষ্ট করেছিস্ তার জন্য বরং দু'চার আনা ধ'রে নিস্।"

নবীন হুঁকাটা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তুমি ওগুলো নামিয়ে ঘরে তোল, আমি বরং মধু'র সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আজ রাত্রেই সে চ'লে যাবে বললে, এই বেলা ভিন্ন আর হয়ত দেখাই হবে না। এতটা যে করলে, তার জন্যে একটু বলা কওয়া—"

বাধা দিয়া কঠিন স্বরেই অভয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। যে লোক অমন নির্দ্দয় ব্যবহার করতে পারে, তার এটুকু দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে যেতে হবে না।"

নবীন যেন আকাশ হইতে পড়িল—

"তুমি বলছ কি অভয়া? সে বেচারা কতকালের জন্যে যাচ্ছে—হয়ত যখন ফিরবে—"

অভয়া কঠিন মুখে বলিল, "থাক্, অতটা বাড়াবাড়ির দরকার দেখছি নে।"

ইহার পর আনন্দের আতিশয্যে নবীন দাস যতবার কথা বলিতে গেল, ততবারই অভয়ার কাছে ধমক খাইল।

দৃষ্টি তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সাংসারিক বুদ্ধিটাও নাকি তাহার বড় কম—সেই জন্যই সে অভয়ার গম্ভীর অথচ

বিমর্ষ মুখখানা দেখিতে পাইল না, তাহার আর্দ্র কণ্ঠস্বর শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

মধুসূদন যে তাহাকে তাহার ভিটা ফিরাইয়া দিয়া গেল— এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান ছিল না।

(৮)

রাত্রি ন'টার মেল—

মধুসূদন ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাশীতে তাহাদের একখানা বাড়ী ছিল, এ পর্য্যন্ত সে বাড়ী ভাড়া দেওয়া ছিল। গত মাস হইতে ভাড়াটিয়া উঠিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কাল রাত্রেই সে প্রস্তাব করিয়াছিল, আজই সে কাশী যাইবে, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিবে।

আকাশ সেদিন পরিষ্কার, অসংখ্য নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই পরিষ্কার নীলাকাশের পানে তাকাইয়া মধুসূদন ভাবিতেছিল—পিছনে যে-দেশ ফেলিয়া চলিল তাহারই কথা।

দিদি জিজ্ঞাসা করিল, "আবার দুইমাস পরেই তো ফিরব, মধু?"

মধুসূদন একটু হাসিয়া বলিল, "কি দরকার আর ফিরে আসবার, দিদি? বাবা বিশ্বনাথের পায়ে কত লোকই আশ্রয়

পাচ্ছে, আমরাও দুই ভাই বোনে সেখানে আশ্রয় পাব, আর এ সংসারে ফিরবার কি দরকার?"

দিদি এ মতলবের কথা আগে জানে নাই, জানিলে হয়ত কাশী-যাত্রার আয়োজন হইত না। তাই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "ওমা, তুই বলছিস্ কিরে, দেশে আর ফিরবিনে না কি?"

মধুসূদন বলিল, "দেশে আমাদের তো কেউই নেই দিদি।"

দিদি আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কেউ নেই সত্যি—দেশ তো আছে।"

মধুসূদন গম্ভীর মুখে বলিল, "দেশের টান আমার কেটে গেছে দিদি, সেই জন্যেই আমি যাচ্ছি। এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে রেখে গেলুম,—যদি নেহাতই দরকার পড়ে, না হয় একবার আসা যাবে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিদি মুখ ফিরাইল।

সেদিন রাত্রি বারটার মেল যখন ছাড়িয়া গেল, তখন গ্রাম-বাসী নিদ্রামগ্ন কেবল একটী গৃহে একটী প্রাণী জাগিয়া ছিল। সে কান পাতিয়া শুনিল, মেল আসিল এবং ছাড়িয়াও গেল।

বালিসের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া অতি গোপনে সে কতখানি চোখের জল ফেলিল, তাহা জানেন একমাত্র অন্তর্য্যামী!

শেষ-পত্র

প্রিয় সুপ্রভা,

সে দিনে পথে চলতে হঠাৎ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি আমার পানে তাকিয়েছিলে, হয় তো ভাবছিলে যাকে দেখলে বাস্তবিকই সে তোমার সেই ছোট বেলার বন্ধু মৃদুলা কি না। আমি তোমায় দেখেই তাড়াতাড়ি পার্শ্বের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম, তোমায় দেখা দিতে সত্যই আমার ইচ্ছা হয় নি।

বলবে—তখন যাকে দেখা দিতে এতটা বাধল, আজ তাকে পত্র লিখছি কেন? আমি তোমায় পত্র দিচ্ছি কেন তা বলতে গেলে এখন বলতে পারছিনে। তোমায় আমার জীবনের সব কথাগুলো না জানালে আজ যেন আমি শান্তি পাচ্ছি নে।

বাল্যকালের কথা বোধ হয় না বললেও চলে। তুমি ছিলে আমাদেরই বাড়ীর পাশে, আমরা দুজনে ছোট বেলায় এক সঙ্গেই খেলা করতুম। মনে পড়ে ভাই আমাদের ছোট বেলাকার সেই দিনগুলো কি আনন্দেই না কেটে গেছে। সে দিন কোথায় ছিল কে? আমাদের মাঝে সেদিন কেউ এসে দাঁড়ায়নি, ছিলে শুধু তুমি আর ছিলুম আমি।

হারাণো-স্মৃতি

তোমার কি মনে পড়ে ভাই—সেই দিনগুলোর কথা? ভোর হতে সারাদিন আমাদের বিশ্রাম ছিল না। তুমি আর আমি নিত্য শিবপূজা করতুম, প্রতিদিন ভোরে উঠে ফুল তুলতে, বেল-পাতা আনতে আমাদের কি আনন্দই না হতো।

এই তো সেই বৈশাখ মাস,—মনে পড়ছে ছোট দুটি মেয়ে উঠোনের একধারে পুণ্যিপুকুর নিয়ে বসেছে, তারা একসঙ্গেই বলছে :—

পুণ্যিপুকুর পুষ্প মালা
কে পূজে রে দুপুর বেলা?

আজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবি—সে দিনগুলো কোথায় গেল? কোথায় ছিলুম—কোথায় এসেছি, স্বপ্নেও যা ভাবিনি তাও তো ঘটে গেল।

কিন্তু না, এসব কি বলতে বসেছি। হয়তো বিরক্ত হচ্ছ, ভাবছ এসব কি বলছি। বোন, অতীত তোমার কাছে কিছুই না, বর্ত্তমান তোমার কাছে বড় সুন্দর—বড় মনোরম, কিন্তু আমার কাছে ওই অতীতের দামটাই খুব বেশী, বর্ত্তমান যে আমার কাছে জ্বালাপ্রদ।

আগে তোমারই বিয়ে হয়ে গেল, আমার বিয়ে তখন হল না। গরীবের মেয়ে, রূপ থাকলে কি হবে—অর্থ যে নেই।

বিধবা মা আমায় নিয়ে বড় ভাবনায় পড়লেন, দেশের লোকও তো বড় কম কথা শুনায় নি।

বাংলার মেয়ে—বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে একটু বড় হলে তাকে তো বড় কম কথা শুনতে হয় না; তবু শুনেও সে বেঁচে থাকে; বাইরে মুখ দেখাতে লজ্জা করে, সে তাই লুকিয়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন শুনলুম আমার বিয়ে—একজন বড়লোক নাকি আমায় বিয়ে করবেন।

তিনি ধনী বলে নয়—আমায় যে দয়া করে উদ্ধার করেছেন এই কথা ভাবতে আমার হৃদয়খানা ভক্তিতে ভরে উঠল।

বিয়ে হয়ে গেল, তারপর স্বামীর বাড়ী গেলুম।

স্বামী যে কি খেয়ালের বশে আমায় বিয়ে করেছিলেন তা জানিনে। তাঁকে দেখেছিলুম সেই বিয়ের সময়ে, তারপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।

ক্রমেই তাঁর পরিচয় পেলুম। বাড়ীর সঙ্গে নাকি তাঁর সম্পর্ক নেই, বাড়ীতে অথচ আত্মীয়স্বজন সকলই আছেন। তিনি দিনরাত বাগানবাড়ীতেই থাকেন, কদাচিৎ বাড়ী আসতেন। বড় হাসি পেত—শিব, তোমায় আমি যথার্থ পূজাই করেছি। কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করে প্রার্থনা করে যেন শিবের মত স্বামী পায়, আমার স্বামী যে কি সে পরিচয় আমি পেলুম না।

হারাণো-স্মৃতি

শুনলুম তাঁর প্রথম স্ত্রী আজ সাত বৎসর গতায়ু হয়েছেন, এই সাত বৎসর তিনি এই ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বাড়ীর ভার তাঁর জনৈক আত্মীয়ের হাতে থাকে।

রাণীর মত ছিলুম—কিন্তু এ ত আমি চাইনি। আমি মনের শান্তি তৃপ্তি হারিয়েছিলুম, মনে হচ্ছিল আমার গায়ের মূল্যবান গহনাগুলো ও কাপড় জামা আমায় উপহাস করছে।

মা পত্র দিতেন—স্বামী দেবতা—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করো, সে পত্র পেয়ে আমি হাসতুম; মনে হতো…ভক্তি যাকে করব সে কোথায়?

স্বামী হঠাৎ একদিন বাড়ী এলেন, শরীর তাঁর বড় অসুস্থ।

এ সময় আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। ভক্তি শ্রদ্ধা যতদূর হোক বা না হোক—মানুষ-ভেবেই আমি তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করে ভাল করতে চাইতুম।

তাঁর বন্ধুরা এ সময় তাঁকে দেখতে যাওয়া আসা করতেন। শুনে চম্‌কে উঠো না সুপ্রভা—তোমার স্বামী সুকুমার বাবুও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। জানিনে তুমি তোমার স্বামীর সে মূর্ত্তি দেখেছ কিনা কিন্তু আমি দেখেছি! আজ তিনি সাধু

সন্তানের সামনে আদর্শ পিতা—কিন্তু সেদিন তিনি যা ছিলেন তা আজ তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।

আজ তিনি হয় তো অতীতের কথা ভুলে গেছেন কিন্তু আমি তা ভুলি নি। আমার মনে সে কথা জলন্ত অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে।

স্বামী সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। কিছুদিন তিনি বাড়ীতে থাকলেন, মাঝে মাঝে যে বাগানে যেতেন না এ কথা বলতে পারিনে। সুকুমার বাবু তোমার সম্বন্ধ নিয়ে আমার কাছে আসতেন, তাতে স্বামী কোন দিনই আপত্তি করেন নি। কিন্তু যদি আপত্তি করতেন তা হলেই ভাল হতো।

এই সময়ে আমার চিত্রাণী জন্মগ্রহণ করলে। সে যখন দুই বছরের তখন আমার স্বামী মারা গেলেন। শোক যে হয় নি একথা বলতে পারব না। তবে খুব বেশী যে হয় নি এ কথা আমি স্বীকার করব। তাঁর ব্যবহারে আমি সত্যই তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বাসতে পারি নি, তিনি আমায় কতদিন পদাঘাত করেছেন, চুল ধরে ঘরের বার করে দিয়েছেন, আমি নিঃশব্দে সবই সহ্য করে নিয়েছি—কাউকে জানাইনি। তাঁর মৃত্যু আমায় যেন বাঁচার স্বাধীনতা এনে দিলে—অন্ততঃ তখন আমার তাই মনে হল।

বলবে—আমি পাপিয়সী, সত্যই আমি তাই, নইলে আজ কোথায় ছিলুম—এখানে এলুম কি করে? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়ে সব হারিয়ে সামান্য কয়টা টাকা বেতনের জন্যে পথে পথে ফিরছি কেন?

তোমার স্বামীই আমার সর্ব্বনাশ করেছিলেন, এ কথা আজ সঙ্কোচে তোমায় জানাচ্ছি বোন।

যে দিন সংসার সমাজ সব ফেলে—নিজের কলঙ্ক ঢাকার জন্যে—আমার চিত্রাকে পর্য্যন্ত ফেলে তোমার স্বামীর সঙ্গে পথে বার হলুম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নি—এ দরজা আমার কাছে চিররুদ্ধ হয়ে গেল।

আমার শাশুড়ী তখনও বর্ত্তমান, আমার অধঃপতনের খবর পেয়েই তিনি বৃন্দাবন হতে চলে এলেন, তাঁকে লুকানোর জন্যই আমি নিজের মাকে দেখতে যাওয়ার নাম করে বার হয়েছিলুম।

মার কাছে পৌঁছাতে মা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেলেন, বজ্রকণ্ঠে বললেন—"কি করেছিস মৃদুলা, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, আমার বুকের দুধ খেয়ে তোর এই অধঃপতন হল? এ পাপ লুকাতে তুই এসেছিস কোথায়—তোর মায়ের কাছে? তুই দূর হয়ে যা, আমি জানব আমার মেয়ে বেঁচে নেই—সে মরে গেছে।"

হারাণো-স্মৃতি

আর সেখানে মুহূর্ত্তকাল থাকতে সাহস হল না, আমি আবার রওনা হলুম।

আমার শাশুড়ী দয়াবতী রমণী, অনেক দুঃখিনী পতিতাকে তিনি নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, পতিতারা যাতে সৎপথে থাকে তার উপায় করে দিয়েছেন, তাঁর পতিতা পুত্রবধূকে কি এতটুকু স্থান দেবেন না ; হয়তো দিতে পারেন—তাঁর পা দুখানা জড়িয়ে ধরলে তিনি আমার একটা উপায় করবেনই।

তোমার স্বামী আগেই সরে গিয়েছিলেন, আমার সঙ্গে ছিল আমারই বৃদ্ধা দাসী। তাকে নিয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলুম। চিত্রার জন্য বুকটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল,—সে যে আমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না, তাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে ?

কিন্তু হায় রে, সে দ্বার আমার কাছে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার শাশুড়ী আমায় স্থান দিলেন না! স্থিরকণ্ঠেই বললেন, "তোমার যেখানে খুসী তুমি চলে যেতে পার, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল তবু তাঁর পায়ের কাছে আছড়ে পড়লুম—"মা, এত পাপীকে স্থান দিয়েছেন, আমায় এতটুকু স্থান দেবেন না ; মুহূর্ত্তের ভুলের শাস্তি আমায় আজীবন কাল বইতে হবে ?

তিনি চঞ্চল হননি, তেমনি ভাবেই বললেন "না, কারণ

তুমি চিত্রার মা, ওর গর্ভধারিণী। তুমি গৃহত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে জেনেছে তার মা মরে গেছে, আমাদের আত্মীয় স্বজন জেনেছ তুমি মরে গেছ। এ রকম মায়েরও উচিত সন্তানের সামনে না থাকা। ও যখন বড় হবে তখন মায়ের যোগ্য সম্মান ওর কাছ হতে তুমি পাবে কি? সে অপমান হওয়ার চেয়ে— তিলে তিলে মরার চেয়ে তুমি একেবারেই আত্মহত্যা কর গিয়ে যাও—তোমার কলঙ্ক কেউ জানতে পারবে না।"

মরব ভেবেছিলুম কিন্তু মরতে পারলুম না; আশা আমায় বাঁচিয়ে রাখলে। মরলে আমি আমার চিত্রাকে দেখতে পাব না, বেঁচে থেকে যেমন করেই হোক—ওকে আমি দেখতে পাব। আমি ওর সামনে যাব না, তফাত থেকে লুকিয়ে দেখব।

সন্ধান করে তোমার স্বামীর কাছে গেলুম।

ব্যারিষ্টার সাহেব আমায় চিনতে চাইলেন না, শেষ কালে জোর করে যখন তাঁর সামনে গেলুম তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন, "সোজা পথ পড়ে রয়েছে চলে যাও, আমায় জ্বালাতন করো না। আমার সংসার আছে, সমাজ আছে, স্ত্রী আছে, তোমার জন্যে আমি সব নষ্ট করতে পারব না।"

তাই বটে, তার সব আছে আমার কিছু নেই। ইচ্ছা হল —একবার চীৎকার করে বলি—আমারও কি কিছু ছিল না?

হারাণো-স্মৃতি

আমার মা—আমার শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন—সকলের উপর আমার মেয়ে চিত্রা—

কিন্তু না, কি হবে বলে? পুরুষের কিছুই যায় না, যায় মেয়েদের। এতটুকু ভূলের জন্যে, এতটুকু আত্মসংযমের অভাবে তারা আমার মত করেই সর্ব্বস্ব হারায়।

ফিরলুম।

কিন্তু কোথায় যাব—আমার গর্ভে যে সন্তান, আত্মহত্যা করব, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণহত্যাও করব?

এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে পথে পথে ফিরছিলুম।

আশ্রয় অবশেষে মিলল, একজন দয়ার্দ্র মিশনারী আমায় আশ্রয় দিলেন।

তাঁর আশ্রমেই আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। এ যেন সেই চিত্রা,—ঠিক সেই মুখ, সেই চোখ সেই সব।

বায়স্কোপের ছবি যেমন করে মিলিয়ে যায়, সেও তেমনি মুহূর্ত্তের তরে জেগে উঠে মিলিয়ে গেল, আমার কোল শূন্য হল।

কাঁদলুম না—কাঁদতে পারলুম না। বুক যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল, শুধু আকাশের পানে একবার তাকালুম।

আমি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হলুম।

হারাণো-স্মৃতি

এ ছাড়া আমার আর উপায় কি—পথ কই? আমার জীবনে তখন দারুণ বিতৃষ্ণা এসেছিল, যথাসর্ব্বস্ব হারিয়েছি—ধর্ম্ম তার কাছে এমন মূল্যবান্ জিনিষ নয়। আমার সব গিয়ে যদি কেবলমাত্র আমি চিত্রাকে পেতুম—আমি স্বর্গও তুচ্ছ করতুম।

কলকাতায় থাকতে পারলুম না—পাছে কেউ আমায় দেখে ফেলে। ওদেরই কাজ নিয়ে আমি বিদেশে চলে গেলুম।

দীর্ঘ দিন কেটে যায়, আমি আশায় থাকি। এমন একদিন আসবে যে দিন আমি আমার পরিচিত কাহারও সামনে গেলেও ওঁরা আমায় চিনতে পারবেন না।

এক একবার কলকাতায় আসতুম, সন্ধ্যার সময় সেই বাড়ীখানার পাশে পাশে ঘুরতুম। ওপরের বারাণ্ডায় মাঝে মাঝে দেবকন্যার মত মেয়েটীকে দেখতে পেতুম—কচি গলার গান শুনতে পেতুম।

দেখতে সে কি সুন্দরই হয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ত।

প্রায় ষোল বছর এমনি করে কেটে গেল।

আমার সেই সময় বসন্ত হল।

সে যাত্রা বেঁচে উঠলুম—ভাল হয়ে একদিন আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে নিজেই শিউরে উঠলুম।

একি ভীষণ আকৃতি হয়েছে। সমস্ত মুখ ক্ষতচিহ্নে ভরে গেছে, গায়ের সে উজ্জ্বল রংও কালো হয়ে গেছে, আমার পরিচিতেরাও হঠাৎ আমায় দেখে চিনতে পারবে না।

সকলেই দুঃখিত হয়েছিল, মিসেস দত্ত বলেছিলেন—'দুঃখ কর'না মৃদুলা—এ সবই ভগবানের দান। তিনি তোমায় অসীম রূপ দিয়েছিলেন, আবার কেড়ে নিয়েছেন, তাঁর দয়ার দানের ওপর আমাদের কথা বলা চলে না।

কথাটা শুনে বড় হাসি পেয়েছিল। তুচ্ছ রূপ, কেউ তো জানে না—আমি কে—আমি কি হারিয়েছি? আমার সর্ব্বস্ব গেছে—আমার চিত্রা পর্য্যন্ত নেই।

সত্যই আমার বড় আনন্দ হচ্ছিল—কেননা আমি দেখতে একেবারে বদলে গেছি, আর কেউ আমায় দেখে চিনতে পারবে না। আমি যেন হঠাৎ আজ মুক্তির আনন্দ পেলুম, রূপ নষ্ট হওয়ার মত এমন আনন্দ আমি আর কখনও পাইনি।

মেম সাহেবকে জানালুম—আমি কলিকাতায় যেতে চাই, এখানে আর থাকতে পারছি নে।

মেম সাহেব তাতে আপত্তি করলেন না। আমি নিজেই

কলকাতা হতে থেকে বার হয়ে এসেছি, তাঁরা আগে আমায় কলকাতায় রাখবার জন্যেই চেষ্টা করেছিলেন।

ফিরে এসে আগেই আমি খোঁজ নিলুম—চিত্রা কোথায়।

শুনলুম—কয়েক বছর আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে শ্বশুর বাড়ী রয়েছে।

আরও শুনলুম—তার একটী মেয়ে হয়েছে, সে মেয়েটীও এই সাত বছরের হল। আমার শাশুড়ী মারা গেছেন, সম্পত্তি সব আমার মেয়েই পেয়েছে।

আমার মনে চকিতে একটা আশা জেগে উঠল। চিত্রা যখন ছেলে মানুষ ছিল তখন তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একটী মেয়েকে আমার শাশুড়ী নিযুক্ত করেছিলেন। কতবার ইচ্ছা হয়েছিল যদি আমায় কেউ চিনতে না পারত আমি এই কাজ নিতে পারতুম।

যদি চিত্রার মেয়ের শিক্ষার ভারটা নিজের হাতে নিতে পারি—আমার এই একমাত্র লক্ষ্য হল।

মনে এখন ভয় নেই—কেউ আমায় চিনতে পারবে না। শাশুড়ী যদি বর্ত্তমান থাকতেন হয়তো তিনি কোনদিন না কোনদিন চিনতে পারতেন। চিত্রা আমায় চিনবে না, সে যখন মাত্র দুই বছরের তখন আমি চলে এসেছি। পরিচিত

কেউ যদি আমায় দেখে তারা কেউ চিনবে না—এ সাহস আমার ছিল।

নিজের মেয়ের দুয়ারে নিজে আজ ভিক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়ালুম।

জামাই নীরেনকে দেখলুম। এমন সুপুরুষ ছেলে আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখিছি। আমার চোখে হঠাৎ খানিকটা জল এল—আমার অদৃষ্ট—তাই আমার সব থাকতেও আমার আজ কিছু রইল না।

সে আমায় তার স্ত্রীর কাছে যেতে বললে; মেয়ের শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ সেই করবে।

একজন দাসী আমায় ভিতরে নিয়ে গেল।

আমার মেয়ে—আমার চিত্রা।

রাজরাণীর মত সে—কি তার রূপ—আমি শুধু পলকহীন চোখে তার পানে চেয়ে রইলুম।

এই আমার চিত্রা যাকে আমি দুই বছরের মেয়ে রেখে চলে এসেছি।

একটী ছোট মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে, সে যেন আমার সেই ছোট বেলার চিত্রা।

আমার মেয়ে আমায় বিশেষ করে পরীক্ষা করলে, বোধ হয় আমায় তার পছন্দ হল, সে বাইরে তখনই খবর দিয়ে পাঠালে

—এঁকেই আমি কল্যাণীর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করলুম, আজ থেকে ইনিই থাকবেন।

সেইখানেই থেকে গেলুম।

সে আমারই মেয়ে, কল্যাণী আমারই নাতনী। আজ যে এখানে গৃহিণীর আসন আমারই জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে আজ আমি বেতনভোগিণী দাসী মাত্র।

কতবার ইচ্ছা হ'ত কল্যাণীকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার ছোট্ট মুখখানা চুমোয় চুমোয় ভরে দেই, চিত্রাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একবার চীৎকার করে বলি—ওরে চিত্রা, তোর মা মরে যায়নি, এই পাপীয়সীই তোর মা।

কতবার হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তখনই জ্ঞান ফিরে এসেছে, আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়েছি। উঃ, এ কথা কি প্রকাশ করবার?

দেখতুম চিত্রা আমারই যৌবনের ফটোখানা প্রত্যহ পূজা করে। সে তো স্বপ্নেও জানে না তার যে মাকে সে পূজা করে সে দেবী নয়? সে মরে যায় নি; সে আজও বেঁচে আছে, সে কুলত্যাগিনী রাক্ষসী। আমার পরিচয় যদি সে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আমার পুণ্যবতী গর্ব্বিতা মেয়ে সে আঘাত সইতে

পারবে না, সে আত্মহত্যা করবে; আমার এ দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বপ্রভা, মা হয়েছ, আমার অবস্থা একবার ধারণা করতে পার কি? নিদারুণ তৃষ্ণায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে, সামনে শীতল পানীয়, কিন্তু তা স্পর্শ করবার অধিকার আমার কই? সমস্ত রাত পড়ে সেদিন কেঁদেছিলুম—ভগবান—মুহূর্ত্তের ভুলের শাস্তি আমায় সারাজীবন ধরে এমনই করে দিলে, এ কালি আর মুছতে পারলুম না। সেদিন পড়াতে গিয়ে একজনকে দেখে হঠাৎ আমি বিবর্ণ হয়ে গেলুম, তিনি আমাম পিস শাশুড়ী, আমার শাশুড়ী যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তখন ইনিই বাড়ীর গৃহিণী হয়ে ছিলেন। ইদানিং তিনি কাশীতে ছিলেন, অনেকদিন পরে একবার চিত্রাকে দেখতে এসেছেন।

তিনি বদ্ধদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন, আমার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হ'য়ে গেল—আমি ধরা পড়েছি।

আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলুম, তিনি আমায় ডাকলেন, "একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

চিত্রা হেসে উঠল,—"ঠাকুমা যেন কি, ওঁর সঙ্গে তোমার কি কথা থাকতে পারে? উনি কল্যাণীকে সকাল সন্ধ্যায় পড়াতে আসেন আর—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "তা আমি জানি চিত্রা, তোকে

আমায় তা বলে দিতে হবে না। তুই এ ঘর হতে চলে যা দেখি, আমি ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলব।”

আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। চিত্রা আমার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকিয়ে চলে গেল, পিসীমা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রুঢ় কণ্ঠেই বললেন “তারপর এখানে কি মনে করে এসেছ —কথাটা শুনতে পাই কি?”

বুকের মধ্যে কাঁপছিল, তবু সাহসে ভর করে বললুম “আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। আপনি যার কথা মনে করে আমার সঙ্গে কথা বলছেন, আমি সে নই, আমি মিসেস রায়।”

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ তা আমি জানি। শোন বউ মা, তুমি আর সকলের চোখে ধূলো দিতে পারবে, আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না। মাঝে তেইশ বছর কেটে গেছে, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার মন বর্ত্তমান ছেড়ে অতীতে আজও ঘুরে বেড়ায়। বসন্তের চিহ্ন তোমায় কতকটা বিকৃত করে দিলেও তুমি আমার চোখ এড়াতে পারনি।”

আমি বসে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকালুম। তিনি বিকৃত কণ্ঠে বল্‌লেন, “স্বেচ্ছায় সব বিসর্জ্জন দিয়ে গেছ সে কথা আজ মনে নেই কুলত্যাগিণী। চিত্রার পুণ্যের সংসারে আবার তুমি পদার্পণ করেছ কোন সাহসে বল দেখি? একটুও ভাবনি

সে তোমার গর্ভজাত সন্তান হলেও সে কোথায় আর তুমি কোথায়? সে যখন শুনতে পাবে, তার যে মাকে সে দেবী বলে পূজা করে সে মা দেবী নয়, সে পিশাচী রাক্ষসী কুলত্যাগিনী তখন তার মনের অবস্থা কি রকম হবে ভাব দেখি?

"মাগো—"

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন ধড়াস করে পড়ে গেল। দাসীদের চীৎকার কানে এল—"ওমা, কি সর্ব্বনাশ হল গো!'

পিসীমা একেবারে শিউরে উঠে দরজা খুলে ফেললেন। দরজার সামনেই মূর্চ্ছিতা চিত্রা, তার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত ছুটছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও জ্ঞান হারিয়ে দরজার পরেই পড়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান ফিরে এল দেখলুম আমার পাশে দুজন দাসী বসে। আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে তারা চলে গেল; খানিক পরেই পিসীমা এসে ঘরে ঢুকলেন।

আমার সামনে তিরিশটা টাকা রেখে তিনি বললেন, "তোমার এই মাসের মাইনে এই রইল, নিয়ে এখনি এ বাড়ী হতে চলে যাও; আর কোনদিন এ বাড়ীতে এসো না, তোমায় বার বার করে বলে দিচ্ছি। যাও, এখনি চলে যাও, এক মিনিট দেরী করো না। মোটর প্রস্তুত আছে, তোমায় তোমার বাড়ী পৌছে দিয়ে আসবে।

তিনি চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর পা দুখানা জড়িয়ে ধরলুম,

কেঁদে বললুম—"আমি এখনি চলে যাচ্ছি, আর আসব না। একটা কথা শুধু বলে যাব চিত্রা—আমার মেয়ে কেমন আছে ?

পিসীমা অন্যদিকে মুখ ফিরালেন, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "তার এখনও জ্ঞান হয় নি।"

ধীর পদে উঠলুম। টাকা পড়ে রইল, আমি কাঁপতে কাঁপতে বার হয়ে এলুম।

সেই আমার শেষ আসা—সে আজ এক মাসের কথা। আজ কোথায় সে জানতে চাও ?

সে সেই—সত্যই সুপ্রভা—সে নেই, সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে; মায়ের প্রাণ যে থাকব কোথায়? সারাদিন পাগলের মত এদিক ওদিক ঘুরতুম, সন্ধ্যার সময় ওদেরই বাড়ীর সামনে রকে গিয়ে বসে থাকতুম।

তারপর তার সহজ জ্ঞান আর ফেরে নি। শুনলুম সেই দিনই তার জ্বর এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বিকার ধরেছিল। সে শুধু চীৎকার করত—না গো না, আমার মা বেঁচে নেই, সে মরে গেছে। সে রাক্ষসী নয়, দেবী।"

কেউ তার মনের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারলে না। অভাগিনী মেয়ে আমার—আমার কলঙ্ক সইতে না পেরে নিজে চলে গেল। সে নয় কলঙ্কিনী মায়ের মেয়ে—এত নীচ নিজেকে সে ভাববে কি করে ?

হারাণো-স্মৃতি

পাগলের মত ছুটে গেলুম—তোমাদের বাড়ী। কোন রাক্ষস আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তার সর্ব্বনাশ করব, তার রক্ত পান করব—তবে আমার জ্বালা মিটবে। সতের আঠার বছরের একটী মেয়ে সে যখন বর্ত্তমানকেই দেখেছিল, ভবিষ্যতের পানে চায়নি, তাকে বয়স্ক পুরুষ হয়ে সে নিয়ে এল কোথায়? অথচ সে তো সুখে শান্তিতে রয়েছে। সে তো স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি নাতনী নিয়ে এখন সাধু হয়ে বাস করছে; আমি সব হারালুম কেন? তার অতীতের অপরাধ আজ চাপা পড়ে গেছে, আমিই সব অপরাধের বোঝা বয়ে যাচ্ছি।

তোমার স্বামী সবেমাত্র বাড়ী ফিরছিল, আমি লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরলুম।

লোকজন এসে আমায় ছাড়িয়ে দিয়ে মারতে লাগল, তাদের মারের চোটে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলুম; যখন জ্ঞান হল—দেখলুম আমি পথের ধারে পড়ে আছি। আজ আমার কথা শুনতে কেউ নেই, লোকে আমায় পাগল বলছে।

কেমন করে বুঝাব আমি পাগল নই, আমি মানুষ, আমার মধ্যেও জ্ঞান আছে।

আমি মরব—কিন্তু মাকেও যেন আমায় দেখে ভয় পাচ্ছে। কতবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে পারি নি,—লোকে জানতে পেরেছে, পাগল বলে তারা আমায় চোখে চোখে রেখেছে।

তবু আমি মরব সুপ্রভা—আমি মরব। মরে নরকে যেতে হবে সেই এক বড় ভয় করে। চিত্রা স্বর্গে গেছে, তার মত পুণ্যবতী মেয়ের মা বলে তাকে কি সেখানে একটীবারও দেখতে পাব না! সেই ছোট মেয়েটীর মতই এসে কি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখবে না? আমি এ চিত্রাকে চাইনে; এ চিত্রা আমায় পাগলিনী বলে ঘৃণা করবে, আমি—আমি ছোট চিত্রাকে চাই।

আমি ঘৃণিতা—পাপিনী—কিন্তু আমার চেয়েও পাপী নেই কি সুপ্রভা? আমি যে মেয়ে; এতটুকু পাপ আমার সমাজের চোখে, দশের চোখে এমন কি ধর্ম্মের চোখে ও এড়িয়ে যাবে না; কিন্তু যারা আমাদের সর্ব্বনাশ করে ঘরের বাইরে এনে ছেড়ে দেয়, সব থাকতে সব হতে বঞ্চিত করে, তাদের পাপ তো কেউই দেখতে পায় না। সমাজ তাদের নিজের বুকে জায়গা দেয়, দশে তাদের দোষ ভুলে যায়, ধর্ম্মের চোখেও বোধ হয় তারা নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হয়। আমার মত কত অভাগিনী সব থাকতে সব-হারা, কেউ কি তার হিসেব করে? তোমার স্বামীর মত কত পুরুষ আজ সমাজের নেতৃস্থানীয়; তাদের অতীত জীবনের কথাই বা কে মনে করে? আমার কথা বিশ্বাস না হয়—তোমার স্বামী দেবতাকে জিজ্ঞাসা করো। বাল্যসখী মৃদুলা।

সমাপ্ত

গল্‌দাচিংড়ির রসবড়া, চিংড়িমাছের সহিত বুটের ডাল, তেল ঝোল, ছেঁচড়া, ডিমের প্রলেহ, ডিমের মলিদা, ডিমের মোহনভোগ, ডিম্বামৃত, ডিমের কাটলেট, ডিমের বড়া, ডিমের পুরী ও ডিমের মধুরাম্ল, মাংস প্রকরণ, পাঁঠার কারি বা ঝোল, মাংসের ভর্ত্তা, মাংসের কোপ্তা ও মাংসের অম্ল, মাংসের কাটলেট ও চপ, মাংসের রোষ্ট, মাংসের গেরেল, আনারসের চাটনি, আলুর চাটনি, পুদিনা শাকের চাটনি, আলুবখরার চাটনি, পায়স, ফুলকো লুচি, খাস্তার লুচি ও কচুরী, বড় কচুরী ও সিঙ্গেড়া প্রস্তুত প্রণালী, পাঁপর ভাজিবার প্রণালী ও ঝালবড়া প্রস্তুত, নিম্‌কি, পাটনাই নিম্‌কি, গজা ও বালুসাই প্রস্তুত প্রণালী, বঁদে ও মিঠাই প্রস্তুত, মিহিদানা, জিলাপী, অমৃতি, ছানাবড়া, ছানার মালপোয়া ও রসমাধুরী প্রস্তুত প্রণালী, নিখুঁতি করণ, খাজা প্রস্তুত-প্রণালী, মুগের বরফি, গোলাপী চন্দ্রপুলী, মাড়োয়ারী হালুয়া, কমলালেবুর বরফি, ক্ষীরের গুজিয়া, ক্ষীরের বরফি, গোলাপী চম্‌চম্‌, ক্ষীরের আপেল, ক্ষীরের লুচি, চন্দ্রমাছ, চন্দ্রানন, খৈচুর, সরপুরিয়া, রসবড়া, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, লেডিক্যানি, চম্‌চম্‌ প্রস্তুত প্রণালী, ক্ষীরের মনোরঞ্জন, ক্ষীরের ছাঁচ, তাল ক্ষীর, বরফি, গোলাপী রসগোল্লা, পাকা আমের বঁদে ও কুমড়ার মেঠাই, সীতাভোগ, ছানার মুড়কি ও ছানার পায়স, ছানার মালপোয়া, কিস্‌মিসের মোহন ভোগ, রাবড়ী, খাসা মোণ্ডা ও কস্তুরো সন্দেশ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, তালশাঁস সন্দেশ, আম সন্দেশ, সর চূর্ণ, ক্ষীরের পানতুয়া, পেস্তার বরফি, খেজুর রসের পায়স ও বঁদের পায়স, মানকচুর রুটী ও পায়স, চিড়ার পিঠা, ভাজা মুগের বরফি ও পিঠা, গোকুল পিষ্টা এবং কলার পিঠা, গোপালভোগ পিঠা, পরিশিষ্ট নানাবিধ পুডিং মোরব্বা, নানাবিধ জেম জেলী, চাটনী, সাগু এরারোট ও মানমণ্ড, খৈ ও যবের মণ্ড ও সুজির রুটী, মাংসের জুস, কুলের আচার ও বেগুনের আচার, তেঁতুল, কুল, আমড়া, লেবু, আদা প্রভৃতির আচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাক-প্রণালী বহু আছে—

তবে "লক্ষ্মীশ্রী" কিনিবেন কেন?

কারণ—

—ইহাতে ত সর্ব্বপ্রকার রন্ধন ও জলখাবার তৈয়ারী শিক্ষা আছেই, তদ্ব্যতীত ইহাতে কোন মাসে কি কি আনাজ তরকারী রোপণ করিতে

হয়, সর্ব্বপ্রকার ফল ও চারা রোপণ প্রণালী, সার দেওয়া, পরিচর্চ্চা প্রভৃতি চাষের বিস্তারিত বিবরণ, রোগীচর্চ্চা, রোগীর পথ্য তৈয়ারী, গৃহকার্য্য, গৃহ-শৃঙ্খলা, পত্র-লিখন-প্রণালী, ধোপার হিসাব, জমা খরচ প্রভৃতি, সাংসারিক খুটিনাটী বিষয়, সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা, পিতামাতা, একান্নবর্ত্তী পরিবার, শ্বশুর-শাশুড়ী, গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী প্রভৃতির সহিত কর্ত্তব্য ও ব্যবহার, ডিপথিরিয়া, হাম, পাঁচড়া, কৃমি, দাঁত উঠা, সর্দ্দি, কাসি, আমাসা, শিশুপালন, রোগীর সেবা ইত্যাদি এত অধিক শিক্ষণীয় বিষয় কুললক্ষ্মীদিগের জন্য আর কোনও বাংলা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। একখানি লক্ষ্মীশ্রী থাকিলে সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। প্রত্যেক বধূকে প্রকৃত গৃহিণীতে পরিণত করিবে। যে কোন বইর দোকানে বসিয়া এই শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তকের সহিত দেখিয়া সূচীপত্র মিলাইয়া তুলনা ও গুণ বিচার করিয়া কিনিলে অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

মেয়েদের উপহার দিতে—

৺পূজার বাজারে—বিবাহের উপহারে "লক্ষ্মীশ্রী" অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ পুস্তক আর নাই

ইহার কাছে বাজে উপন্যাস কিছুই নহে

ছাপা—কাগজ—বাঁধা—প্রথম শ্রেণীর

সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

লক্ষ্মীশ্রী সম্বন্ধে অভিমত—

পুস্তক খানিতে সামান্য অন্নব্যঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া, কালিয়া পোলাও, মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী বিবিধ প্রণালী বেশ সহজ সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণ ব্যয় পড়ে তাহাও তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গীতে সহজেই জানা যায়। যাঁহারা বাঙ্গালীর সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী তাঁহাদের নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

১৩৪২, ১৬ই চৈত্র আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবার 29th March 1936 Sunday.

প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রীমতী বনলতা দেবী তদীয়া দাদাশ্বশুরের এই জীবনচরিতখানি লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১০০ বৎসরের পূর্ব্বকার ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা ৫০ বছর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল কিম্বা আর কিছুকাল পরে সংগ্রহ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হয় ত হইয়া পড়িত। "প্রাণনাথ মল্লিকের চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগে ইঁহার জ্ঞাতি ও স্বজন মিলিয়া প্রায় ১০০ ঘর বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।'' তদ্দারা ব্রাহ্মসমাজের যে মহান্ উপকার ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে উপনয়ন সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৺প্রাণনাথ মল্লিকই ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের ও বেদীতে বসিয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করার অধিকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন ও বিপ্লব আনয়ন করেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগদান এবং প্রকাশ্যে চলাফেরা তাঁর বাটীর মেয়েরাই সর্ব্বপ্রথম করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তিনিই। প্রবর্ত্তকে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অষ্টমবর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায়ন লিখিতেছেন :—',বাগআঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। * * * 'প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলে "উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ * * * কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন?" * * * কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" ইহার পরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করিলেন। উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রহ্মোপসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে অমনি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে, যদি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" কেশবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া * * * গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল।" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদগুরুসঙ্গ, বিজয় কথামৃত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

এই বহিতে সেকালের বহু ঘটনার সঙ্গে প্রবীণ লেখক লেখিকাদের লিখিত অনেক লেখা যোগ করা হইয়াছে, যেমন :—প্রাণনাথ মল্লিকের পুত্র রজনীকান্ত মল্লিক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিতেছেন :—"তিনি সহৃদয় ছিলেন, আমাদের সহিত সরল-ভাবে মিশিতেন, আমরা তাঁহাকে সম্মান করিতাম" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাণনাথ মল্লিকের জামাতা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন রায় বাহাদুর লিখিয়া-ছেন :—আমার পরম পূজনীয় বন্ধু পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমার নিকট শুনিতে চাহিয়াছ। আমি আনন্দের সহিত আমার

পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া এই সামান্য দুই চারি পংক্তি লিখিতেছি।" বলিয়া তখনকার পুরাতন ঘটনা সম্বন্ধে একটি সুদুর্লভ প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম-এ মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার কথা লিখে লিখিতেছেন স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বাগচি মহাশয় আমার সমবয়স্ক ছিলেন। তিনি আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।......তিনি অতি সরল এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। নিয়মিত ব্রহ্মোপসনাতেও তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রভৃতির প্রবন্ধ ও বহুলোকের চিঠি ইহাতে আছে। ৺প্রাণনাথ মল্লিক ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম উপবীত ও জাতিভেদ প্রথা রহিত ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব ও ফল আজ সকল সমাজই ভোগ করিতেছেন। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

২য় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া কতকগুলি হাফটোন চিত্রসহ প্রকাশিত হইল। এই বই কোন দল বিশেষের লেখা নহে। সেজন্য এই গুরুত্বপূর্ণ জীবনীতে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট ভাষায় কাহারও মুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া প্রীতি ও অপ্রীতিকর তথ্যপূর্ণ ঘটনা বহুল বিষয়সহ লিখিত। দল বিশেষ ব্যতীত আব সকলেরই এই জীবনী এত আদরণীয় হইয়াছিল যে এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। ছাপা, কাগজ, বাঁধানো সবই খুব সুন্দর। দাম ২॥০ টাকা মাত্র। স্কুলের প্রাইজে ও প্রিয়জনকে উপহার দিতে উৎকৃষ্ট বই।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন ঃ—

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থ জনসাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অনন্যসাধারণ পুরুষ—তাঁহার বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যকুশলতাকে লেখক যথাসম্ভব নৈপুণ্যের সহিত সংক্ষেপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিচারশক্তি প্রশংসনীয়। একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাত দোষ জীবনা-লেখকের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর—সৌভাগ্যবশতঃ আলোচ্য পুস্তকের লেখক এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত। আমরা আশাকরি এ সংস্করণটিও জনসাধারণে আদৃত হইবে। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪২

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কেদার বদ্‌রী ভ্রমণ কাহিনী

৭০ বছরের বৃদ্ধা মহিলা শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা কেদার বদরী ভ্রমণ করিয়া অতি সরল ভাষায় এই ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়াছেন। বহুজ্ঞাতব্য ঘটনাসহ লিখিত। বহু খুঁটীনাটী বিবরণ সহ এরূপ ভ্রমণকাহিনী অবশ্য পাঠ্য। ছাপা কাগজ সবই খুব সুন্দর। দাম খুব সস্তা ৸০ আনা মাত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :—সাদাসিধা সোজা ভাষায় লেখা এই ভ্রমণ-কাহিনী কোন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে না বটে, তবে ইহার ভিতর লেখিকার আন্তরিক সারল্য ও ধর্ম্মভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উপভোগ্য। স্থানে স্থানে বর্ণনার মাধুর্য্য দেখা যায়—লেখিকার প্রকাশ ভঙ্গীও মোটের উপর বেশ প্রশংসনীয়। বইখানি পড়িয়া গৃহস্থ মহিলারা আনন্দ পাইবেন আশা করা যায়। ৩রা ফাল্গুন ১৩৪২। প্রবাসী বলেন :—ভক্তিমতী তীর্থযাত্রিণীর সরল ভ্রমণকাহিনী। প্রবাসী চৈত্র ১৩৪২

নেপালের পথ—।✓০

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস বলেন :—

বৈশাখী উষা। সাল ১২৮৯। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সবেমাত্র বৈঠকখানায় বসিয়াছি। সন্নিকটে খাজাঞ্চী বাড়ীতে :—

"রাধেকৃষ্ণ প্রাণধন মোর
যুগলকিশোর—"

এই উষাকীর্ত্তনের সুর তখনও মিলাইয়া যায় নাই। এমন সময় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক আমার হাতে চারিটাকা দর্শনী আগাম দিয়া বলিলেন, গৌরচন্দ্র মুন্সেফ মহাশয়কে প্রথমেই দেখিতে হইবে। মুন্সেফ মহাশয় জমিদার ও ধনী। শুনিলাম তিনি কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হোমিওপন্থী চিকিৎসাধীন। তাঁহারা এলোপাথিক চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত।

ডাক্তার মহাশয়ের সেই সময়ে খুব প্রতিপত্তি। শুনিলাম যেদিন আমি মুন্সেফ মহাশয়ের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছি সেইদিনই তিনি বাগআঁচড়াভিমুখে গমন করিয়াছেন। কিছুদিন পরে ফিরিলেন নববধূ সঙ্গে লইয়া। বধূ আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, যেন দুই সহোদরা ভগ্নী। সকলেই তাঁহার সরলতার প্রশংসা করিতেন। মনটী যেন মুক্তদ্বার প্রকোষ্ঠ। যে কেহ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেন ঐ প্রকোষ্ঠের অন্তর্গত সমুদয় পদার্থ দেখিয়া ফেলিতেন।

আমাদের সাযাহ্নে উপাসনায় কৈলাসবাবু প্রতিদিন যোগদান করিতেন। উপাসনার পর বসিত প্রেতাত্মাচক্র। আমার স্ত্রী ছিলেন মধ্যবর্ত্তী বা মিডিয়ম। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে সমুদয় সঙ্গীত বা উপদেশ রচনা করিতেন তাহা কখনো আমি লিখিতাম কখনো তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আমার স্ত্রী সঙ্গীত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সুরের একটা আভাস দিতেন ছন্দের সঙ্গে। সেই সুরের তানলয় সহকারে যখন গান করিতাম, কৈলাসবাবু এবং আমি যে আনন্দ অনুভব করিতাম তাহার তুলনা নাই।

সে সময়ে আমরা তিনঘর "আনুষ্ঠানিক" ব্রাহ্ম ছিলাম। কৈলাসবাবুর, চন্দ্রকুমার বাবুর এবং আমার পরিবার। আমি যখন চন্দ্রকুমারবাবুর সঙ্গে পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার প্রবল প্রতাপশালী ভ্রাতা, স্বর্গীয় সীতামোহন দাস রায় বাহাদুর কৈলাসবাবুর উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাতে কৈলাসবাবু বিচলিত হন নাই।

পরে তিনি যখন নবহিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধি হইল বাগচী। পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। তিনি যে সাহিত্যানু-রাগিণী ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না।

"কেদারবদরী ভ্রমণ" এবং "নেপালের পথ" গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গম তীর্থপথে যে কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে তিনি চলিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই কষ্ট স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণীতেই সম্ভব।

আনন্দবাজার বলেন :—প্রবীণা মহিলার লিখিত দুর্গম নেপাল ভ্রমণের কাহিনী। পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হইলেও চিত্তাকর্ষক। রবিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৪৩

প্রবাসী বলেন :—রক্সৌল হইতে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত লেখিকা কিভাবে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, পুস্তকে তাহার বর্ণনা আছে। যাঁহারা নেপাল যাইতে ইচ্ছুক, পুস্তকখানি তাঁহাদের উপকারে লাগিতে পারে। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪৩

বঙ্গরত্ন বলেন :—এই পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, যাঁহারা শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথ দর্শনার্থে নেপাল যাত্রা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তক একখানি সঙ্গে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকখানি পড়িলে বা পড়া থাকিলে নেপালের পথে যাতায়াত করায় কোন কষ্ট হইবে না। বইখানি পড়িলে যেন মনে হয় নেপালের সকলই প্রত্যক্ষ করিলাম। লেখিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

নেপাল উপত্যকায় শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ অধিষ্ঠিত, পথ অতি কষ্টকর যাত্রীবর্গ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নানাবিধ অসুবিধায় কষ্ট পাইয়া থাকেন সেইজন্য 'নেপালের' পথ লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইল'। ভবিষ্যতে যাত্রীবর্গ যেন অসুবিধায় না পড়েন,—ইহাই লেখিকার মহৎ উদ্দেশ্য, আমাদের মনে হয় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা